বাংলায় অগ্নি যুগ

(উদ্যোগপর্ব বা সংগঠনযুগ)

শ্রীক্ষীরোদ কুমার দত্ত এম-এ

হিন্দী প্রকাশনী ভবন

১০, ডিকসন লেন, কলিকাতা-১৪

প্রকাশক :
শ্রীসুধারঞ্জন ঘোষ দস্তিদার, এডভোকেট
১০, ডিকসন লেন, কলিকাতা-১৪

প্রথম সংস্করণ

মূল্য ১॥০

প্রিণ্টার : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত
রূপশ্রী প্রেস
৩৬, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

আমার কথা

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেছে যারা জীবনের জয়গান, বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে একদিন হয়েছিল তাদের যাত্রা সুরু। পথের কাঁটা পায়ে দলে, মেঘের গুড়ুগুড়ু, বজ্র বিদ্যুৎ উপেক্ষা করে চলছিল তারা সম্মুখপানে, মাতৃভুমির হীনদশা প্রাণে বেজেছিল তাদের। আত্মভোলা এই তরুণের দল, আত্মাহুতিকেই করেছিল জীবনের ব্রত, আত্মদানে মায়ের পূজামণ্ডপ গড়ে তুলবে, সেখানে আবার প্রতিষ্ঠা করবে মাকে মহিমময়ী রাজ-রাজেশ্বরীরূপে—এই ছিল তাদের ব্রত। এইজন্যই হাতের পিস্তল তাদের গর্জে উঠেছিল একদিন ইংরেজ রাজশক্তিকে লক্ষ্য করে, দেশের বৈরীসমাজ লক্ষ্য করে। কিন্তু সহসা অহিংসা এসে দাঁড়াল হিংসার গতিপথ রুদ্ধকরে। অহিংস আক্রমণ সে প্রতিরোধ করতে পারলোনা, বিপ্লবীর হাতের পিস্তল হাতের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে রইল। তরুণের বিজয়রথ পথের মধ্যেই থামল, তাদের যাত্রা রইল অসমাপ্ত। এই অসাফল্যের গ্লানি আজ তাদের সমস্ত আত্মাহুতিকে আচ্ছন্ন করে আছে। ইংরেজ রাজশক্তি তাদের দিয়েছিল terrorist আখ্যা, এবং নিজেদের তারা রেখেছিল গোপন। তাই সমাজের একশ্রেণীর নিকট আজও তারা অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু সন্ত্রাস সৃষ্টিই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলনা। বিদেশী রাজশক্তির সন্ত্রাসের কারণ তারা হয়েছিল একথা সত্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতের দ্বারা বিরোধী শক্তিকে হীনকরে তারপরে হানতে হবে চরম আঘাত—এই ছিল তাদের নীতি। রুশিয়ায় এই নীতি সফল হয়েছিল, তাই সোভিয়েট রুশিয়া আজ বিপ্লব জগতের শিক্ষক, আর ভারতীয় বিপ্লবীরা বহন করছে পরাজয়ের গ্লানি।

কিন্তু ভারতের বিপ্লবের পর্ব কি সমাপ্ত হয়েছে? বিপ্লবকে ফাঁকি দিয়ে অহিংসা কি তার বিজয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে? অহিংস

বিজয় রথের চাকা তবে কেন থেমে যাচ্ছে পথের মাঝে ? নরনারী এবং শিশুর রক্তে পথ পিচ্ছিল করে তবেই অগ্রসর হচ্ছে সে রথ। এ যখন দেখি তখন ভাবি ভারতের বিপ্লব পর্ব্ব সমাপ্ত হয় নি। বিরোধী শক্তির সঙ্গে অহিংসা করেছে চুক্তি, বৃটিশ শোষক, হিন্দু শোষক ও মুসলিম শোষকদলের মধ্যে হয়েছে দেনা পাওনার হিসেব, এর ফলেই পেয়েছি আমরা ভারত মাতার খণ্ডিত রূপ। কিন্তু শোষিত সমাজ ভারতের কি এই খণ্ডিত রূপ মেনে নিবে ? পাকিস্থানী কৃষক এবং ভারতের কৃষক, পাকিস্থানী শ্রমিক ও ভারতের চাষী পার্থক্য কোথায় এদের মধ্যে ? কি পেয়েছে এরা এই স্বাধীনতার ফলে ? এদেরই মিলিত সাধনায় বিপ্লবের দেবতা আবার দিবেন সাড়া, তার তূর্য্যনিনাদে গণশক্তি জেগে উঠে পুঁজীভারতের এই কৃত্রিম ব্যবধানকে দিবে ভেঙ্গে। শুধু ভারতই ঐক্যবদ্ধ হবে তা নয়, পারস্য, মিশর ও চীনকে নিয়ে গড়ে উঠবে প্রাচীন সভ্যতার এক সম্মিলিত রূপ। হয়ত গ্রীসকেও এর মধ্যে পাওয়া যাবে। পারস্পরিক সৌহার্দ্যই হবে এদের মধ্যে মিলন সূত্র।

এক বিরাট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে হবে এই প্রাচ্য সভ্যতার আত্মপ্রতিষ্ঠা। অনাগত সে বিপ্লবের পদধ্বনি আজ শোনা যচ্ছে। এই বিপ্লব দেবতাকে স্বাগত সম্ভাষণ যারা জানাবেন, অতীত বিপ্লবীদের আত্মনিষ্ঠা থেকে তারা যাতে কিছুটা লাভবান হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই বিপ্লবের ইতিহাস লেখা।

প্রথম খণ্ড উদ্যোগ পর্ব প্রকাশিত হল। পরবর্তী খণ্ডসমূহ ক্রমে ক্রমে প্রকাশের ইচ্ছা আছে। সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি সে দাবী করছিনা। এ সম্পর্কে যে কোন মহল থেকে যে কোন প্রকার সাহায্য সাদরে গৃহীত হবে। ইতি—

অক্ষয় তৃতীয়া
১৩৪৮

ক্ষীরোদ কুমার দত্ত

বাংলায় অগ্নি যুগ

ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগ

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাশী যুদ্ধের পরে বাংলা দেশে বৃটিশের শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার এক ফল্গু প্রবাহ তখন থেকেই বাঙ্গালী জীবনে ধীরগতিতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ হয় এবং ইংরেজের জীবনধারার অনুকরণে বাঙ্গালীর জীবন গড়ে উঠতে থাকে। সে যুগে এ অনুকরণ কোথাও ছিল সচেতন, কোথাও ছিল অবচেতন।

মুসলমান শাসন সময়ে, বিশেষতঃ মুসলমান শাসনের শেষ দিকে বহুদিন ধরেই দেশে শান্তি ছিল না। তাই ব্যাপক অরাজকতা থেকে মুক্ত হয়ে কোন প্রকার শক্তিশালী শাসনের অধীনে নিজেদের ধনসম্পত্তি নিয়ে বসবাস করবে, ধনী শ্রেণীর মধ্যে এ ইচ্ছা প্রবল হবে তা খুবই স্বাভাবিক। পাঁচশালা, দশশালা ও শেষে চিরস্থায়ী ভূমিবন্দোবস্তের ফলে তাদের ভবিষ্যৎ যখন আরও সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে গেল, তখন ইংরেজের প্রতি তাদের অনুরাগ স্বতঃই উপচে পড়তে লাগল। জমিদার সরকারে ও ইংরেজের সওদাগরী অফিসে চাকরি করেও অনেকে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করতে লাগল। ধনিক ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজকে নিজেদের পরিত্রাতা বলেই গ্রহণ করলে।

সাধারণ বাঙ্গালী এবং পরে সাধারণ ভারতবাসীও কিন্তু এই অবস্থা একদিনের জন্যও মেনে নেয়নি। বিজাতীয় ইংরেজী ভাবধারা কোন দিনই তাদের নিকট একান্ত কাম্যবস্তু হয়ে ওঠেনি। তাই প্রথম থেকেই এর সঙ্গে তাদের সংঘাত সুরু হল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, বরকন্দাজ বিদ্রোহ, পিণ্ডারী যুদ্ধ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, নীলকরদের বিদ্রোহ এবং সর্ব্বোপরি সিপাহী বিদ্রোহে আমরা এরই পরিচয় পাই।

ইংরেজের সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসীর এই সংঘাত একটা ধারা বাহিক আন্দোলনরূপে দানা বেঁধে ওঠেনি তার কারণ ধনিক বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কেউ এসে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তারা তখন ইংরেজের অনুগ্রহে উচ্চপদ ও ধনসম্পত্তি ভোগ করছে। ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে একথা তখনও তাদের মনে হয় নি। তাই সাধারণ বাঙ্গালী ও ভারত বাসীর এ আন্দোলনের আগুন, খণ্ড বা আঞ্চলিক বিদ্রোহ রূপেই নিভে গেছে। এর প্রভাবও ভারতীয় জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় নি।

প্রকৃতপক্ষে, যে নব্য বাঙ্গালী একদিন ইংরেজের অন্ধ অনুকরণে আত্মহারা হয়েছিল, ভারতে স্বাদেশিকতা এবং স্বজাতিপ্রীতি তাদেরই দান। এই স্বাদেশিকতার সহজ স্রোত ধরেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে ইংরেজ বিদ্বেষ এবং এরই পরিণতি বাংলা ও সমগ্র ভারতে বিপ্লবান্দোলন, ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন, এরই পরিনতি নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান এবং ১৯৪৭ সালে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে যে ধনিক ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ গড়ে উঠেছিল, প্রধানতঃ তাদেরই সাহায্য ও সহানুভূতিকে আশ্রয় করে

ইংরেজ সমগ্রভারতে রাজত্ব বিস্তার করেছিল। তাই ইংরেজের পক্ষে সেদিন তাদের প্রয়োজন ছিল, সুতরাং সেখানে তাদের সম্মানও কতকটা ছিল। আবার ইংরেজের কাছে সম্ভ্রমের আসনের উপরই ছিল সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে কিছু দিনের মধ্যেই ইংরেজ রাজত্ব দ্রুত সমগ্রভারতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। বাঙ্গালী ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দিয়ে ইংরেজের যা প্রয়োজন তাও মিটল। তা ছাড়া, যে যুগে ইংরেজ ভারতে প্রথম এসেছিল, তখনও তারা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠেনি। তাই এ দেশীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে তাদের একটা সহজ সৌজন্য বোধ ছিল। লর্ড ক্লাইব মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া আসা করতেন। কোন কোন ব্যাপারে ভারতীয় রীতি গ্রহণেও এদের সঙ্কোচ বোধ হত না। ইংরেজ শাসকশ্রেণীর নিকট যাদের এরূপ মর্য্যাদার আসন ছিল, তারা যে নিজেদের ইংরেজের সমভাবাপন্ন মনে করবে, তা বিচিত্র নয়। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এভাবের ব্যতিক্রম ঘটতে বিলম্ব হল না। এ দেশীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে সাধারণভাবে ইংরেজ উগ্র হয়ে পড়ল। ভারতবাসী যে তাদের সমান এ মেনে নিতে তারা অস্বীকার করল। এরই ফলে দেখা দিল দুই দলে সংঘর্ষ।

নব্যসমাজের ইংরেজ প্রীতি

১৮১৩ সালে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এদেশে বাণিজ্য করবার জন্য নূতন সনন্দ দেওয়া হল, বহু ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবেও ব্যবসা বাণিজ্য করতে এদেশে আসতে থাকল। এ যুগ ছিল ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের হৃদ্যতার যুগ। তাই এই সমস্ত ইংরেজ যাতে স্থায়ী

ভাবে এ দেশে বাস করে এবং তাদের সংস্পর্শে এসে ভারতবাসী যাতে সভ্য হয়ে উঠতে পারে এই ছিল নব্যসমাজের আকাঙ্খা। প্রকৃতপক্ষে এজন্য কলকাতায় এক আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এ আন্দোলনের পুরোভাগে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর সহযোগী। কিন্তু এঁদের এই চেষ্টা সফল হয় নি। ইংরেজ এদেশে এসে ব্যবসাবাণিজ্য করেচে কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার মত ভারত তাদের বাসভূমি হবে একল্পনাও তারা করেনি এবং সেদিকে তাদের কোন চেষ্টাও কখনও দেখা যায়নি।

সংঘাত সুরু

কিন্তু ভারতীয় অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠাবান ইংরেজ বণিক ও পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীদের এই সৌহার্দ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অচিরেই এদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিল। ১৮২৭ সালে জুরী আইন পাশ হল। এই আইনে ব্যবস্থা হল যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের বিচার খৃষ্টান জুরীর সাহায্যে চলতে পারবে কিন্তু হিন্দুমুসলমান জুরীর সাহায্যে খৃষ্টান অপরাধীর বিচার চলবেনা, এমনকি, দেশীয় খৃষ্টানদেরও না। এ বৈষম্য দেখে এ দেশীয় অভিজাত নব্যসম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। যে রামমোহন রায় ইউরোপীয়দের এদেশে বসবাসের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তিনিই এই বৈষম্যমূলক আইনের প্রতিবাদ করে চিঠি লিখলেন লণ্ডনে—ক্রফোর্ড নামে এক ইংরেজের নিকট। ১৮২৮ খৃঃ অব্দের ১৮ই আগষ্টের এই চিঠি—পার্লামেণ্টে পেশ করবার জন্য লেখা হয়েছিল। এই পত্রে তিনি লিখেছিলেন—"রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এ বৈষম্য মেনে নেওয়া হিন্দু ও

মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব। এ বৈষম্য যদি চলতে থাকে তবে, ইউরোপীয় জ্ঞানলাভের ফলে শতবর্ষ পরে হলেও এমন একদিন উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয় যখন তারা একযোগে অন্যায় ও গর্হিত আইনগুলির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়বে ও লড়ে তাতে জয়যুক্ত হবে। ভারতবর্ষ আয়ার্লাণ্ড নয়—যে, দুচার খানা রণতরীতে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের সহজেই শায়েস্তা করা যাবে।"

নূতন ভাবধারার প্রভাব

এদিকে হিন্দু কলেজের শিক্ষায় দেশের নব্য যুবক সম্প্রদায় যে শুধু ইংরেজের রীতিনীতির অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, তারা সত্যিকার দেশ প্রেমেও উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিলেন। যে ইংরেজ যুবক শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র সমাজকে দেশপ্রেম শিক্ষায় সাহায্য করেন তাঁর নাম হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। ফিরিঙ্গি হলেও ভারতবর্ষকে তিনি স্বদেশ বলে মনে করতেন। ১৮২৬ সালের মে মাসে তিনি যখন হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি বহু কবিতা লিখে ফেলেছেন এবং ইণ্ডিয়া গেজেট নামক প্রগতিপন্থী পত্রে তা প্রকাশিত হয়েছে। ১৮২৭ সালে তার প্রথম কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়। ফকির অব জাঙ্গিরা' নামক কাব্যের মুখবন্ধে যে স্বদেশ প্রেম ব্যঞ্জক কবিতাটি ছিল তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হল—

অনুবাদ করেছেন দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর—

স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাটতব ; অস্তে গেছে চলি

সে দিন তোমার ; হায় ! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !
কোথায় সে বন্দ্যাপদ ! মহিমা কোথায় !
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগন বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভধ্যায় লোক অভাগা জননী !

ডিরোজিওর এই কবিতাই স্বদেশ প্রেমের প্রথম কবিতা।

ডিরোজিও যখন এদেশে আসেন, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভাবধারা তখন সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এদেশে এসে নিজের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এর প্রচার আরম্ভ করলেন। এর সুফল ফলতে দেরী হল না। নূতন ভাবধারার হঠাৎ ঝলকে হিন্দু প্রধানগণ আতঙ্কিত হলেন বটে এবং এজন্য ডিরোজিওকে নিগৃহীতও হতে হল। ১৮৩১ সালের ২৫শে এপ্রিল তাঁকে হিন্দু কলেজ থেকে অপসৃত করা হল। কিন্তু হিন্দু যুবকসমাজ তাঁর নিকট যে শিক্ষা পেয়েছিল তা ব্যর্থ হয় নি। ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চা করে তারা এরই মধ্যে সকল বিষয়ে স্বাধীন মতামত গঠন করে ফেলেছেন। এরই কষ্টিপাথরে যাচাই করে স্বসমাজের হীনদশা দেখে তা দূর করবার জন্য তারা তৎপর হলেন। ডিরোজিওর

শিক্ষা সম্পর্কে রাধানাথ শিকদার তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন :—"সত্যানু-সন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা—যা সমাজের শিক্ষিত জনের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যা ভারতবাসীর পক্ষে হিতকর না হয়েই যায় না—এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।"

১৮৩০ সাল থেকে আরম্ভ করে পরবর্ত্তী অর্দ্ধশতাব্দী ধরে যাঁরা সমাজের নেতৃত্ব করে গেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র। এঁদের মধ্যে রাম গোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেননি বটে কিন্তু এঁরাও সমাজ হিতৈষণার প্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁরই নিকটে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বাঙ্গালীকে যারা স্বদেশ প্রেম শিখিয়েছেন, তাদের মধ্যে রাম গোপাল ঘোষ অন্যতম।

নব্য যুবকদল ডিরোজিওর শিক্ষায় সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচ বৎসর। হিন্দুকলেজ থেকে অপসৃত হবার মাত্র কয়েকমাস পরে ১৮৩১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বৎসর। কিন্তু এরই মধ্যে সমগ্র শিক্ষিত সমাজকে তিনি স্বাধীনতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ছাত্র সমাজের ভিতর দিয়ে প্রবীণদের মধ্যেও এভাবে ব্যাপ্ত হয়েছিল। ১৮৩০ সালের শেষদিকে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছে প্রথম সুযোগেই তিনি স্বাধীন ফ্রান্সের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাহক বলে সম্মান দেখালেন।

রাম মোহন এদেশে থেকেই ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার অনুযোগী হয়েছিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় মনুমেণ্টের পাদদেশে

ফরাসী বিপ্লবের 'বাস্তিলদিবস' উদ্‌যাপিত হত। এই অনুষ্ঠান কোন সাল থেকে আরম্ভ হয়েছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু রামমোহনের মৃত্যুর পরেও তার শিষ্যগণের উদ্যোগে প্রতি বৎসর নিয়মিত এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হত। বহু পরিবর্ত্তনের পর এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাই আমাদের জাতীয় পতাকায় পরিণত হয়েছে। তাই আজিকার স্বাধীন ভারতের এ পতাকার কথা ভাবলেও এরই মধ্যে দেখতে পাই আমরা সেদিনের সেই বাঙ্গালী সমাজের বৈপ্লবিক চিন্তা ধারা।

ফরাসী বিপ্লব ব্যতীত বিশ্বের আরও কতকগুলি ঘটনা এই সময়ে বা এর কিছু আগে থেকেই বাঙ্গালী মনকে সক্রিয় ও সচেতন করে তুলছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা চেষ্টা, ইউরোপীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলির স্বাধীনতা লাভ, ইংলণ্ডে ধর্ম্মগত বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি বাঙ্গালীর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথালিকদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়। এর আগে তাদের পার্লামেণ্ট বা ভোটের সভায় সভ্য হবার অধিকার ছিলনা। সরকারী চাকুরীতেও তাদের স্থান ছিল না। বিশ্বের সর্বত্র এই মুক্তি প্রচেষ্টা বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজকে প্রভাবান্বিত করবে এ বিচিত্র নয়।

বাঙ্গালী প্রচলিত সমাজদ্রোহী

কিন্তু প্রথমদিকে এই স্বাধীনতাস্পৃহা তাদের নিকট ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপেই আত্মপ্রকাশ করল। নব্য সমাজ পুরাতনকে ভেঙ্গে তারই উপর গড়তে চাইল নূতনের ভিত্তি। এর

ফলে তাদের মধ্যে কতকটা উচ্ছৃংখলতা যে এসে পড়েনি তা নয়। বিজাতীয়দের নিকট আহার্য্য গ্রহণ, গো-মাংস ভক্ষণ প্রভৃতি এদের ধর্মহীনতা প্রগতিপন্থী রামমোহনের প্রাণেও ব্যথা দিয়েছিল। কিন্তু দেশপ্রীতিই যে তাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল তাতে সংশয় নাই। সমাজকে ভাঙতে তারা চেয়েছিল গড়বার জন্যই। ধ্বংসের নেশায় তারা মেতেছিল কিন্তু অন্তরের দেশপ্রীতির শুভবুদ্ধি তাদের চিনিয়ে দিল জাতীয় অগ্রগতির সহজ পথটা। ক্রমাগত ভাঙবার ব্যর্থতার মধ্যেই তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা শেষ হয়নি। তাই ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর নবজাগরণ নূতন সৃষ্টির উন্মাদনা সমগ্র জগৎকে চমকিত করেছিল। মাত্র পঞ্চাশ বছরের চেষ্টায় একটা জাতি গড়ে উঠল এবং জন্মের সঙ্গেই সে জাতি গ্রহণ করলে জগতে শিক্ষকের আসন। এ উদাহরণ জগতে অন্যত্র দুর্লভ।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ধ্বংসোন্মাদনার মধ্যেই আমরা পরিচয় পাই বাঙালীর বিপ্লবী মনের। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী বাংলাকে আমরা এখানেই দেখি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাঙালী চিরদিনই নূতনের পূজারী। বৌদ্ধযুগে এই বাংলা ও বিহারকে ভিত্তি করেই বুদ্ধের ধর্মনীতি সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচারিত হয়েছিল। ইংরেজ আমলেও ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা বাংলাদেশ থেকেই সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হয়েছে। বর্ত্তমান যুগে ভারতে সাম্যবাদের প্রসারেও এর ব্যতিক্রম হয়েছে মনে হয় না। তাই বাংলায় দেখি চিরদিনই নূতনের আবাহন। পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ কোনদিনই তার সৃষ্টিতে বাধা জন্মায়নি।

কিন্তু ব্যাপকভাবে ধরতে গেলে বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা চিরদিনই ব্যর্থ হয়েছে। বিপ্লবের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে কিন্তু এর ফলে বাঙ্গালী আত্ম প্রতিষ্ঠ হতে পারে নি। বৌদ্ধ যুগান্তে পুনরুত্থান যুগে আমরা বাঙ্গালীকে

দেখি—সে সমগ্র ভারতের নিকট অস্পৃশ্যপদবাচ্য। ইংরেজশাসনে আবার বিভিন্ন আন্দোলনে বাঙ্গালী নেতৃত্ব করেছে বহুদিন ধরে। কিন্তু বর্ত্তমানে নবভারতের সৃষ্টিপ্রচেষ্টায় বাঙ্গালীর কোন স্থান নেই। বোধহয় বিপ্লবের ধর্ম্মই এই—বিপ্লবী অন্যকে সার্থকতার পথ দেখায় কিন্তু বিপ্লবীর নিজের জীবনে বিপ্লব সার্থকতা এনে দেয় না। ফরাসী বিপ্লবেও আমরা এই দেখি। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী শুধু ইউরোপকে নয়, সমগ্র বিশ্বকে এক নবজীবনে উদ্বুদ্ধ করেছে কিন্তু বিপ্লবের ফলে ফরাসী জাতি নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে নি। এমন কি বিপ্লবপূর্ব ফরাসী জাতির যে প্রাণ শক্তির পরিচয় আমরা পাই, বিপ্লবান্তিক ফরাসী জাতির প্রায় দুই শতাব্দীর ইতিহাসে তার সন্ধান মিলেনা। এরও যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। রুশবিপ্লবে এর ব্যতিক্রম দেখি। বিপ্লবী রাশিয়াই জগতে রুশ জাতিকে পরিচিত করেছে এক দুর্দ্ধর্ষ শক্তিরূপে। ফরাসী বিপ্লবের ফ্রান্স হিটলারের নিকট দশ দিনের মধ্যেই নতি স্বীকার করেছে। কিন্তু বিপ্লবী রাশিয়া শুধু হিটলারের বিজয়ী অগ্রগতি রুদ্ধ করেনি তাকে পরাজিতও করেছে। কিন্তু এরও যে কারণ নেই তা নয়। বিপ্লব আনে ধ্বংসের নেশা। এই নেশায় একবার মেতে উঠলে কোথায় এসে থামতে হবে সে জ্ঞান বিপ্লবীর থাকে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ হয়েছে তার সংগ্রাম, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরেও সে সংগ্রাম সে চালাতে যায় অন্য পথে। এই পথেই দেখা দেয় আত্মকলহ প্রভৃতি। বাঙ্গালী জীবনে ব্যর্থতার মূলেও বোধ হয় এই। এ সময়ে শক্তিশালী এবং সার্থক নেতৃত্ব পেলে হয়ত জাতি রক্ষা পেতে পারে।

ইংরেজের কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ

১৮১৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনন্দ দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৩ সালে তার মেয়াদ শেষ হল। নূতনকরে যে সনন্দ দেওয়া হল তাতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত করা হ'ল। এর পরিবর্ত্তে দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব রইল তার হাতে। ব্যবসার জন্য এতদিন ধরে যে ঋণ হয়েছিল তা চাপানো হল ভারতের ঘাড়ে। এতে ভারতবাসীরা ক্ষুণ্ণ হ'ল। এতদিনে তারা অনেকটা আত্ম সচেতন হয়ে উঠেছে। সনন্দের আরও একটি ব্যাপার ভারতবাসীর মনঃপূত হয়নি। ভারতবর্ষে সভ্যতা বিস্তারের অছিলায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের হস্তে টাকা দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল সনন্দে।

তাই এ সনন্দ মেনে নিতে ভারতবাসী সম্মত হল না। প্রতিবাদে সভা হল ১৮৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারী কলকাতার টাউন হলে। সভাপতি হলেন কলকাতার শেরিফ ডবলিউ হিকি। সভায় প্রধান প্রস্তাব উত্থাপন করলেন থিয়োডোর ডিকেন্স নামে আর একজন ইংরেজ। উনবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে বেসরকারী ইংরেজদের সঙ্গে এদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মেলামেশা এতই সহজ হয়ে উঠেছিল যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সকল আন্দোলনেই আমরা এদেশে উভয়কে এক সঙ্গে দেখি। প্রতিবাদসভায় আরও অনেক গণ্যমান্য ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। ভারতবাসীর পক্ষ থেকে সভায় মতামত ব্যক্ত করলেন রামমোহনশিষ্য "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকার সম্পাদক রসিক কৃষ্ণ মল্লিক। তিনি সুস্পষ্টভাষায় বললেন—"এ আইন ভারতবর্ষের উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ হয়নি; কোম্পানীর অংশীদার এবং ইংরেজ জাতির উপকারের জন্যই এরূপ আইন করা হয়েছে। * * * আমরা একেই অত্যধিক

ঋণভারে প্রপীড়িত। এর উপর পার্লামেণ্ট আবার এই অতিরিক্ত ব্যবসাগত ঋণের বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপিয়েছেন। * * * যদি কোম্পানীর কর্মচারীদের বোকামি ও অব্যবস্থার জন্য এ ঋণ হয়ে থাকে তাহলে এ ভার তাদেরই স্কন্ধে পতিত হওয়া উচিত ছিল, আমাদের স্কন্ধে নয়। * * * অনেকে হয়ত মনে করেন, সামরিক ও বেসামরিক খ্রীষ্টান কর্মচারীদের জন্য ধর্মযাজক নিয়োগ যুক্তিযুক্ত। এর যুক্তিযুক্ততা আমি অস্বীকার করিনা। কিন্তু সামান্য অন্নবস্ত্রেরও কাঙ্গাল দুর্গত ভারতবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ—ভারতীয় রাজস্ব কেন তাদের ভেতরে এমন একটি ধর্ম প্রচারে ব্যয়িত হবে—যা তারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের পরিপন্থী মনে করে? * * * ভারতীয়দের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা এমন একটি ধর্ম্মে তাদের দীক্ষাদানের জন্য ব্যয় করা হবে—যে ধর্ম্মকে তারা মোক্ষ লাভের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর বলে মনে করে।”

ইংরেজের কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ এই বোধ হয় প্রথম। নব্যদলের দেশপ্রীতি যে ক্রমে প্রতিবাদের রূপ গ্রহণ করছিল, তা আমরা রসিককৃষ্ণের বক্তৃতা থেকেই বুঝতে পারি।

১৮৩৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর স্যার চার্লস মেটকাফ আইন জারী করে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল এপ্রিল মাস থেকে। এরজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ৮ই জুন এক সভা হ'ল। দেশী ও বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে এক অভিনন্দন পত্র দেন এই সভায়। সভায় অসবোর্ণ নামক এক ইংরেজ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে দেশীয় পত্রগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া সঙ্গত হবেনা। তাঁর এ উক্তির উত্তর দেন রসিককৃষ্ণ—

“অসবোর্ণ স্বীকার করেছেন যে তিনি দেশীয় সংবাদপত্র বুঝেন না,

এমনকি তার নামগুলিও পড়তে পারেন না, অথচ তিনি তাদের দূষছেন ভয়ানকভাবে। দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে এ সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞান থাকা তার উচিত ছিল। * * কি দেশীয়, কি ইউরোপীয় কোন সংবাদপত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচার করতে পারে না, এবং ইংরেজীর ন্যায় দেশীয় সংবাদপত্র একই আইন দ্বারা শাসিত হতে পারে। এদেশীয়দের উপর এরূপ অবিশ্বাস কেন? ভাল মন্দ সকল জাতের মধ্যেই আছে।"

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন একটা নির্দিষ্ট ধারায় চলতে সুরু হয়। এতদিন ধরে তারা শুধু প্রতিবাদ সভা করেছেন, এবং তারপর স্মারকলিপি বা আবেদন পত্র পাঠিয়েছেন। কোন রাজনৈতিক সঙ্ঘ বা সমিতি তাদের ছিল না। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ছিলেন এ সময়ে সমাজের নেতা। তাঁর সাপ্তাহিক "রিফর্মার" এই ধ্বনিত হত জনমত। এর চলতি ছিল অন্যান্য সব কাগজের চেয়ে বেশী। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। নাম হল—"বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা।" নামে পরিচয় বুঝা যায় না, কিন্তু এই হ'ল বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। দ্বারকা নাথ ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সংবাদ প্রভাকরের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি একাজে প্রসন্ন কুমারের সহযোগী ছিলেন। ১৮৩৬ সালের শেষভাগে এই সভা গঠিত হল। এর নিয়মাবলীর মধ্যে একটি নিয়ম এই ছিল যে ধর্ম বিষয়ক আলোচনা এখানে হবে না। যে সব রাজকার্য্যাদির সঙ্গে ভারতবাসীর ঘনিষ্ঠ যোগ তারই আলোচনা ও বিবেচনা এখানে হবে।

কিন্তু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারিচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যপন্থীদের এ আন্দোলনের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। তাদের আন্দোলন বইছিল অন্য খাতে—শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কাজের মধ্য দিয়ে। ১৮৩৮ সালে তাদের সঙ্ঘ—Society for the acquisition of General knowledge (জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা) প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ইতিহাস, সাহিত্য, শিক্ষা এবং রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ চলত। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এদের মাসিক পত্রিকা বেঙ্গল স্পেক্টেটর প্রকাশিত হল। সংবাদপত্র দ্বারা নিঃস্বার্থ দেশসেবার নিদর্শন এই প্রথম। আরম্ভেই এরা লিখলেন—অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাগজ প্রকাশিত হয়নি।

চক্রবর্ত্তী চক্র

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী জ্ঞানোপার্জ্জিকার এক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ছিলেন এ সভায় সভাপতি। সভায় অনুষ্ঠান হচ্ছিল হিন্দু কলেজ ভবনে। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর প্রবন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত ও পুলিশ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করলেন। হিন্দু কলেজের সেই সময়ের অধ্যক্ষ ডি এল রিচার্ডসন সভায় উপস্থিত ছিলেন অভ্যাগত রূপে। দক্ষিণারঞ্জনের সমালোচনার কঠোরতায় উত্তেজিত হয়ে বললেন—"কলেজ ভবনকে আমি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হতে দেবনা।" তাঁর এই মন্তব্যে আপত্তি করলেন সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন—"রিচার্ডসন এখানে কলেজের অধ্যক্ষ নন, নিমন্ত্রিত অতিথি মাত্র। তাঁকে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।

দক্ষিনারঞ্জন এবং সভার সহকারী সভাপতি কালাচাদ শেঠও সভাপতির এই নির্দেশ সমর্থন করেন। সমবেত চাপে রিচার্ডসন তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হলনা। "ইংলিশ ম্যান," ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকা নব্যদলকে এনিয়ে নানা-ভাবে গালি দিলেন। সভাপতি তারাচাঁদ ছিলেন বলে তারা নাম দিলেন "চক্রবর্ত্তি ফ্যাকসান" বা "চক্রবর্ত্তি চক্র"। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ছিল এই সময়ের সর্বপ্রকার বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক। তারা এনিয়ে লিখল—এরূপ রাজদ্রোহ মূলক বক্তৃতা বাটাভিয়া বা সামরঙে (যবদ্বীপ) দিলে, কম করে হলেও, বক্তাকে নিবাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হত। কিন্তু এই তারাচাঁদ সম্পর্কেই একজন ভারতহিতৈষী ইংরেজ জর্জ টমসন লিখেছিলেন—"এরূপ আগ্রহশীল নীরব বিনয়ী কর্মী খুব কমই দেখা যায়। তাঁর মহৎ কর্মৈষণা এবং সাধুতা প্রত্যেকেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।" এই গুণ ছিল বলেই তিনি ছিলেন নেতা এবং এ জন্যই তিনি ইউরোপীয় সমাজের নিন্দাভাজন হয়ে ছিলেন।

আন্দোলন চলছিল এই ভাবে ধীর গতিতে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক প্রগতির আন্দোলন এই রূপে ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছিল সরকারবিরোধী আন্দোলনে। এইভাবে চলতে থাকলে ভারত বাসীর উগ্র রাজনৈতিক মন গড়ে উঠতে হয়ত বহু বৎসর কেটে যেতো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটল, যার ফলে ঘটনা স্রোতের গতির তীব্রতা বহু গুণ বর্ধিত হল। এর ফলে মাত্র বিশ বছরের মধ্যে বাঙালী বুঝল, সংস্কৃতি মূলক আন্দোলনে কয়েকজন ইংরেজ তাদের সঙ্গে আছেন সত্য কিন্তু তবুও ইংরেজের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য দূর করে যাতে তারাও জগতের অন্যান্য জাতির সমান হতে পারে তারা এজন্য বদ্ধপরিকর হল। এরই ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর

মধ্যে যে মানসিক সংঘর্ষ দেখা দিল তাই ক্রমে ব্যক্ত হল কয়েকটি প্রকাশ্য আন্দোলনে। ইলবার্টবিল আন্দোলন এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নীলচাষ আন্দোলন ও ইলবার্ট বিল

১৮৩৩ সালের সনন্দে এদেশে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রহিত করা হলে বহু বেসরকারী ইংরেজ এসে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করল। নীলচাষ ও চাবাগান প্রভৃতি প্রধানতঃ এদেরই চেষ্টায় গড়ে উঠল। কেউ কেউ আবার জমীদারী প্রভৃতিও কিনে ফেললেন। কলকাতা থেকে সুদূরে এই সমস্ত ইংরেজের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। আইনানুযায়ী একমাত্র কলকতার সুপ্রীমকোর্টেই এদের বিচার হতে পারত। কিন্তু মফঃস্বলের কোন লোকের পক্ষে কলকাতায় এসে নালিশ করা সম্ভব ছিলনা! তাই এরই সুযোগে তাদের নিরঙ্কুশ উপদ্রব ও অত্যাচারের মাত্রা বিশেষভাবে বেড়ে গেল। এমনকি সরকারী কর্মচারীগণ পর্য্যন্ত এদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেত না।

প্রথম দিকে কোম্পানীর ইংরেজকর্মচারীগণের জন্যই এ ব্যবস্থা হয়েছিল। বেসরকারী ইংরেজের সংখ্যা বেশী না থাকায় এতে কোন অসুবিধাও সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ১৮৩৩ সালের সনন্দে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এও স্বীকার করা হয়েছিল যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে যোগ্য বিবেচিত হলেই এদেশবাসী যে কেহ সরকারী কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। ১৮৩৬ সালের শেষদিকে এই ঘোষণা অনুসারে হিন্দু কলেজের নব্যদলের রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি প্রথম ডিপুটি কালেকটার নিযুক্ত হলেন। নব্য দলের আন্দোলন কতকটা প্রশমিত করবার জন্যই এ

ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানীর এই নূতন কর্মচারীদল মফস্বলে গিয়ে দেখলেন সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা সেখানকার বেসরকারী ইংরেজগণের হস্তে এবং সরকারী শাসনের প্রায় কোন ধারই তারা ধারেনা। সেখানকার সর্বপ্রকার শাসনব্যবস্থা চলেছে তাদেরই নির্দেশে।

ব্লাক অ্যাক্ট

কোম্পানীর কর্মচারীদের এই অসহায় ভাব প্রকৃতপক্ষে শাসন ব্যবস্থারই দুর্বলতা—কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এ বুঝলেন। তাই মফস্বলে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তারা সচেষ্ট হলেন এবং এজন্য প্রথমে মফস্বলের ইংরেজদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। জন ইলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন (বেথুন) ছিলেন এই সময়ে বড় লাটের আইন সচিব। তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চারটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করলেন। প্রস্তাবিত আইনে মফস্বলে ইউরোপীয়দের বিচারের ব্যবস্থা হল, তারা কি কি সুবিধা ভোগ করতে পারবে তারও একটা সীমানির্দ্দেশ করে দেওয়া হল। এ ছাড়া, জুরী দ্বারা বিচার ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হল এবং সরকারী কর্মচারীদের সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা হল। কিন্তু আইনের খসড়াগুলি প্রচারিত হ'লে এ দেশীয় ইউরোপীয় সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হল। অধিকার সঙ্কোচের সম্ভাবনা দেখে তারা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠল। তারা এ আইনের নাম দিল 'ব্লাক অ্যাক্ট'। আন্দোলনের তীব্রতা দেখে গবর্ণমেণ্ট ও এ কার্য্যে আর অগ্রসর হতে সাহসী হলেন না। এ হ'ল ১৮৪৯ সালের ব্যাপার।

আইন হ'লনা, কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে এর সুফল ফলল। তারা বুঝল, শুধু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নয়, সমগ্র ইংরেজ জাতি এদেশে রাজত্ব

করছে। ভারতবাসীকে সমানাধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, যে অন্যায় সুবিধাগুলি তারা ভোগ করছে, নিতান্ত বাধ্য না হ'লে তাও তারা ছেড়ে দিবেনা। নীলকরদের অত্যাচার তখন চরমে উঠেছে। ১৮৫০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত এর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বিষয়টির প্রতি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি এনিয়ে তার হিন্দু পেট্রিয়টে ধারাবাহিক ভাবে লিখতে লাগলেন। সাধারণ বাঙ্গালীদের দেশাত্মবোধ বিকাশে হরিশ্চন্দ্র যতটা সাহায্য করেছেন, এত বোধ হয় আর কেউ করেনি। একথা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও বলে গেছেন। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে হরিশ্চন্দ্র পরলোক গমন করেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি বাঙ্গালীর কতটা আপনার হয়ে পড়েছিলেন নীচের দুই ছত্র কবিতা তার প্রমাণ—

নীল বানরে সোনার বাংলা করল্ এবার ছারে খার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হল কারাগার।

১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নীল দর্পণ প্রকাশ করেন। এর ইংরেজী অনুবাদ করেন জেমস লঙ। এই অপরাধে সুপ্রীম কোর্টে তাঁর বিচার হ'ল। বিচারক তাঁকে একমাস কারাদণ্ড ও একহাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। অর্থ দণ্ডের টাকা দিলেন কালী প্রসন্ন সিংহ। লঙ সাহেব এই অনুবাদ করিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদনকে দিয়ে।

সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ১০ মে সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হল। এরপর পুরা দুবছর ধরে এই বিদ্রোহ চলে। কারও মতে সিপাহীবিদ্রোহ

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু তা হয়ত ঠিক নয়। কারণ সিপাহী যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে নবযুগের আরম্ভ নয় প্রাচীন যুগের অবসান। ইংরেজ এসে এদেশীয় সামন্ততন্ত্রকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল, অবশ্য তার নিজেরই স্বার্থে। এই সামন্তরাজ প্রথাকে টিকিয়ে রাখবার জন্যই সেদিন সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল। জাতীয় প্রগতির কোন নিদর্শন এর মধ্যে নেই। বাদশাহী শাসন দেশ তখন চায় নি কিন্তু সিপাহীরা দিল্লীর বাদশাহকেই বসিয়েছিল গদীতে আবার নতুন করে। নয়া বাদশাহী শাসন কায়েমী হলে তার ফল ভারতের পক্ষে কি হত তা বলা দুষ্কর। তাছাড়া, ভারতবাসীর মধ্যে যারা নবজাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ দেখিনা। এরা বরং ইংরেজকেই সমর্থন করেছিল।

তাই সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা সমীচীন হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বিদ্রোহের পরোক্ষ ফল যে জাতীয় আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সরকার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। দুই বৎসর ধরে এই অত্যাচার চলল ভারতীয় জনসাধারণের উপর। এতে অসন্তোষের আগুন সৃষ্টি হল এবং এই আগুনই নবজাতীয়তাবোধকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে চলল।

মফস্বলে সাধারণ ইংরেজদের যে অপ্রতিহত ক্ষমতা সরকারের চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল, সিপাহী বিদ্রোহের জন্য সে সম্পর্কে কোম্পানীর উদ্বেগ অনেকটা কমে গেল বরং বিদ্রোহের কারণে নীলকর ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করলেন। এতে প্রজাদের ক্লেশ বহুগুণ বর্ধিত হল। জনসাধারণ এথেকে মুক্ত হবার উপায় খুঁজতে লাগল।

এই সময়ে বারাসত জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট এসলী ইডেন এই মর্মে

এক ঘোষণা করেন যে জমিতে নীলচাষ করা বা না করা কৃষকের ইচ্ছাধীন, সেজন্য তাদের উপর জোরজুলুম করা বেআইনী। প্রজারা হাতে স্বর্গ পেল। ১৮৫১ সালে অনুমান ৫০ লক্ষ দরিদ্র নিরুপায় চাষী এক যোগে নীল চাষ বন্ধ করে দিল। ফলে নীলকর ইংরেজের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেঁধে গেল। নীলের জন্য ইংরেজ প্রজাকে দাদন দিয়েছে। নদীয়া, যশোহর ও পাবনাতেই নীলচাষ হত বেশী। যশোহর চৌগাছায় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুজন গ্রাম্যলোক নীলচাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষিত সমাজ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব নেয়নি। তবে তত্ত্ববোধিনী, হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি কাগজের লেখা, বিশেষভাবে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক পরোক্ষভাবে নীলচাষীদের সমস্যা সমাধানে খুবই সাহায্য করেছিল। অমৃত বাজার পত্রিকার শিশির কুমার ঘোষও নীলচাষীদের ধর্মঘট পরিচালনায় সহায়তা করেছিলেন।

বাঙালীর নবলব্ধ চেতনা

নীলচাষীদের ধর্মঘটের ফলে নীল কমিশন বসল। বাঙালী মনে করল এবারে হয়ত জোর করে নীলচাষ করান বন্ধ হবে কিন্তু কমিশনের সুপারিশ আশাপ্রদ হয়নি। কমিশন বললেন, নীলচাষের প্রয়োজন আছে। নীলকরদের অত্যাচার নিবারণের জন্য কমিশন কোন নিয়মও বেঁধে দিলেন না। বরং চুক্তিভঙ্গ মোকদ্দমা করে নীলকরগণ বহু নীলচাষীকে গৃহছাড়া এবং সর্বস্বান্ত করে দিলেন। ধর্মঘটের ফলে এবং কলিকাতার সমাজে অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনী প্রচারিত হওয়ার ফলে নীলকরদের উপদ্রব কিছুটা কমে গেল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রং প্রস্তুত আরম্ভ হলে বাংলা দেশ থেকে নীলচাষ ক্রমে লুপ্ত হল। কিন্তু নীলকরদের

অত্যাচার বাংলা দেশে নবযুগের সূচনা করল। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষায়, দীক্ষায় বাঙালী ইংরেজদের নেতৃত্বই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু নীল সংঘর্ষের পরে তারা বুঝল, ইংরেজের স্বার্থ আর ভারতীয়দের স্বার্থ এক নয়। তারা বুঝল, যে সংঘর্ষ আজ আরম্ভ হয়েছে নীলচাষের মধ্য দিয়ে বহু বৎসরে এ মিটবেনা। বাঙালী তখন চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, বাঙালীর নবলব্ধ চেতনা তাকে স্বাধীন হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইংরেজ এ পথে তাকে সাহায্য তো করবেনা বরং পদে পদে বাধা দিবে—বাঙালী এ সুনিশ্চিত ভাবেই বুঝল। তাই শিক্ষিত বাঙালী ক্ষুব্ধ হল অন্তরে অন্তরে। বাঙালীর সাহিত্যে, বাঙালীর সভাসমিতিতে, বাঙালীর নাট্যশালায় আরম্ভ হ'ল এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। রঙ্গলালের পদ্মিনী কাব্য প্রকাশিত হল ১৮৫৮ সালে। পরাধীনতার জ্বালা তখন বাঙালী জীবনে কতটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে রঙ্গলালের কবিতা থেকেই তা আমরা বুঝতে পারি—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?
কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়॥

বাঙালী জীবনে নববুগের প্রভাব এই সময় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজসংস্কারে, সাহিত্যরচনায়, সংবাদপত্রপরিচালনে, ধর্মালোচনায়, নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায়, সভাসমিতি স্থাপনে বাঙালী তখন সমগ্র ভারতে অগ্রণী। এরই মধ্য দিয়ে সে তখন খুঁজছে সমগ্র বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠার

পথ। কিন্তু যে ইংরেজকে এতদিন সে বন্ধু মনে করে এসেছে, এবারে দেখল এ পথে সেই ইংরেজই তার পরম শত্রু।

প্রকৃত পক্ষে, সিপাহী বিদ্রোহের সময়ই ভারতীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের বিচ্ছেদ বৈষম্য পূর্ণ হল, এদেশে ভারতীয় সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজ দুই সম্পূর্ণ আলাদা সমাজে পরিণত হল। ইউরোপীয় সমাজের আগ্রহাতিশয্যেই বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে জঙ্গী আইন জারী করা হল, ভারতীয়দের সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রী করার জন্য এদেশীয় ইংরেজ সমাজ জিদ ধরল এবং তা সরকারী সমর্থনও পেল। বৃটিশ সৈন্যের অত্যাচার শুধু সিপাহীদের উপরই সীমাবদ্ধ রইল না, সাধারণ বাঙ্গালীর বহু ঘরবাড়ীও পুড়িয়ে দেওয়া হল। এই ভাবে বহু গ্রাম একেবারে উচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভারতীয়দের প্রতি ইউরোপীয় সমাজের এই বিদ্বেষ ক্রমে ভারতীয়দেরও ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করে তুলল। ইংরেজের সহায়তায় এতদিন তারা আত্মবিকাশের স্বপ্ন দেখছিল, কিন্তু এবারে বুঝল সেই জাতীয় আত্মবিকাশের জন্যই এদেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক তখন কৃষ্ণদাস পাল। তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরও সম্পাদক। হিন্দু পেট্রিয়টে তিনি এবং সোমপ্রকাশে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইংরেজদের নূতন মনোভাব বিশ্লেষণ করে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে সজাগ করে দিতে লাগলেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হল। রাবণপুত্র মেঘনাদকে এতদিন ধরে ভারতীয় সমাজ জানত সে ভগবানের অবতার রামচন্দ্রের শত্রুদেরই একজন, আর বিভীষণকে জানত রামের বিশ্বস্ত অনুচর সুতরাং তার রাক্ষসত্ব সম্পূর্ণভাবেই ঘুচে গিয়েছিল। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যের নায়ক হ'ল ইন্দ্রজিৎ আর বিভীষণ হল দেশদ্রোহী

এবং জ্ঞাতিদ্রোহী, সে রাক্ষসকুল ধ্বংসের কারণ। বাঙ্গালীর কাছে এ পরিচয় নূতন। কিন্তু তবুও নবজাগ্রত বাঙ্গালী সমাজ এই নূতনকে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করেছিল। যুগযুগ ধরে যাদের একভাবে চিনেছিল, তাদের নূতন করে চিনতে বাঙ্গালীকে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত দেখিনা। তার কারণ বাঙ্গালী তখন দেশপ্রেম শিখেছে আর সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে এর সার্থকতার জন্যই বীর্য্যের উপাসক হতে চাইছে। মধুস্থদনের কাব্যে বাঙ্গালী এই নূতনেরই ঝঙ্কার শুনেছিল, এ যেন নবযুগের আগমনী গান। মেঘনাদ বধ কাব্যের কথা ছিল বাঙ্গালীর নিজেরই মনের কথা তাই কাব্যখানি অমন সমাদর লাভ করে ছিল সেদিন।

বাঙালী জীবনে স্বাদেশিকতা

এক সময় ছিল যখন ইংরেজের চালচলন, ইংরেজের হাবভাব শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের কাছেই অনুকরণীয় ছিল। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই নব্য বাঙ্গালী মদ্যপান করতে আরম্ভ করেছিল। এমনকি, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় বিশিষ্ট স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিও অতিরিক্ত মদ্যপানহেতু নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু ১৮৬০ সালের পরবর্ত্তী বাঙ্গালী সমাজে দেখি ইংরেজকে অন্ধভাবে অনুকরণ করবার মোহ অনেকটা কেটে গেছে। সিপাহী বিদ্রোহই-এর কতকটা কারণ বলে মনে হয়। এই সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে স্বদেশপ্রেমী রূপে আমরা দেখি। তাছাড়া সিপাহীবিদ্রোহের পরে ইংরেজের অত্যাচারই বাঙ্গালীকে অনেকটা ইংরেজ বিমুখ করেছিল, বাঙ্গালী আত্মস্থ হতে শিখেছিল। আমরা দেখি

অন্ধ অনুকরণের কুফল বাঙ্গালী বুঝতে আরম্ভ করেছে। এরই প্রথম অভিব্যক্তি দেখি আমরা মাদক দ্রব্য বর্জন অন্দোলনে। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে প্যারীচরণ সরকার এই মারাত্মক ব্যাধির কুফলের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন চালাবার জন্য তিনি 'ওয়েল উইশার' নামে একখানি ইংরেজী পত্রিকা এবং 'হিতসাধক' নামে একখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী বৎসর তিনি 'টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। একার্য্যে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, এবং রেভারেণ্ড এইচ এ ডল। শুধু মাদক দ্রব্য বর্জ্জনেই নয়, আলাপে ব্যবহারে, রীতি ও চালচলনে বাঙ্গালী জীবনে এই সময়ে স্বদেশিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন কি অনেক ব্যাপারে এবিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি যে না হয়েছে তাও নয়। ১৮৬১ সালে রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা প্রতিষ্ঠিত হল। এই সমিতির সদস্যগণ 'গুডমর্নিং', 'গুড ইভনিং' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'সুপ্রভাত', সুরজনী প্রভৃতি কথা ব্যবহার করতেন। নব্য শিক্ষিত মহলে এতদিন ১লা জানুয়ারীই নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়ে আসছিল। কিন্তু সমিতির সভ্য-গণের উদ্যোগে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উদযাপন আরম্ভ হল। সভ্যদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তায় কেউ ইংরেজী কথা বলে ফেললে তাকে প্রতি কথার জন্য এক পয়সা করে দণ্ড স্বরূপ দিতে হত। শিক্ষিত বাঙ্গালীর অতিরিক্ত ইংরেজীয়ানার প্রতিক্রিয়া তখন এইভাবে নূতন পথ ধরছে।

পূর্ব্বেই বলেছি নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেনি। কানপুরে, দিল্লীতে, এলাহাবাদে ও অন্যান্য স্থানে যখন সিপাহীদের যুদ্ধ চলছে ইংরেজদের সঙ্গে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলকাতায় বসে এই সব যুদ্ধে ইংরেজেরই বিজয় কামনা করেছেন—

ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বল ভাই বৃটিশের জয়।

*　　　*　　　*

পুড়ুক বিপক্ষ দল মনের অনলে,
উড়ুক বৃটিশ ধ্বজা সমুদয় স্থলে।

কিন্তু এই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই নীলকরদের সম্বন্ধে লিখেছেন :—

হলো নীলকরদের অনররি
মেজেষ্টরীভার

*　　　*　　　*

পড়েছে পাতর বক্ষে　　অভাগা প্রজার পক্ষে
বিচারে রক্ষে নাইক আর
নীলকরের হদ্দ লীলে　　নীলে নীলে যত নিলে
দেশে উঠেছে এই ভাষ
যত প্রজার সর্বনাশ।

খৃষ্টান মিশনরীগণ বহু পূর্ব থেকেই এদেশে এসে ধর্ম প্রচার করছিল। এদের প্রচেষ্টা কতকটা সার্থকও হয়েছিল। মধুসূদন দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙ্গালী যুবক স্বীয় সমাজের প্রবল বাধা অতিক্রম করেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই এ অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখি। শুধু সাধারণ বাঙ্গালী নয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীও মিশনরীদের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েন। সমগ্র ভারতবর্ষ খৃষ্টান হয়ে যাবে এই ভয়েই সকলে ভীত হয়ে পড়লেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখলেন—

ভুজঙ্গ হিংস্রক কীট তারে কিবা ভয়?
মণিমন্ত্র মহোষধে প্রতিকার হয়।

মিশনরী রাঙ্গা নাগ দংশে ভাই যারে।
একেবারে বিষ দাঁত সেরে ফেলে তারে ॥
ব্যাঘ্র ভয়ে ব্যগ্র হই যদি পাই বাগে।
লাঠি অস্ত্র থাক্‌লে কি ভয় করি বাঘে ?
হেদো বনে কেদো বাঘ রাঙ্গা মুখ যার।
বাপ বাপ বুক ফাটে নাম শুনে তার ॥

এই বাঙ্গালীই এর আগে ইংরেজদের এদেশে এসে বাস করবার জন্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন—

ওমা কুইন তোমার ইণ্ডিয়া ধাম
কুইন করো নাক
যদি সোণার ভারত খাস করেছ
বাস করে মা থাক থাক।

* * *

প্রজাগণে কোলে টেনে।
ছেলে বলে ডাক ডাক ॥

কিন্তু ১৮৬০ সালের পরবর্ত্তী বাঙ্গালী সমাজে স্বাজাত্যবোধ প্রকট হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই হিন্দু পুনরুত্থান যুগের আরম্ভ। নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী আগে জানত হিন্দুত্বের মধ্যে গৌরব বোধ করবার কিছু নেই। কিন্তু এই সময়ে তার পরিবর্ত্তন দেখতে পাই। এমন কি, যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই নব ভারত গড়তে উদ্যোগী হয়েছিল, তারাও এই নূতন ভাবধারার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেননি। ১২৭৯ সালের ৩১ ভাদ্র কলকাতায় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে একটি বক্তৃতার আয়োজন হল। রাজনারায়ণ বসু বক্তৃতা দিলেন—

হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে। এ সভায় সভাপতি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। এ বক্তৃতা চারদিকে বিশেষভাবে নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন এনে দিয়েছিল।

জার্মাণী, ইতালী প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলের জনগণ ক্ষুদ্র আঞ্চলিক স্বার্থ ভুলে এই সময়ে এক একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত হল। এদেরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'ল নব্য শিক্ষিত সমাজ। ফলে, 'নেশন' এবং 'নেশনাল' কথা দুইটি শিক্ষিত মহলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে নব গোপাল মিত্রের নাম করতে হয়। তাঁর সংবাদপত্রের নাম ছিল 'নেশনাল পেপার', কুস্তীর আখড়ার নাম নেশনাল জিমনাষ্টিক, এবং সভার নাম ছিল নেশনাল সোসাইটী। 'নেশনাল' কথাটির প্রতি এত অনুরাগ দেখে বন্ধুরা আদর করে তাঁর নাম দিয়েছিলেন—'নেশনাল মিত্র'। ভারতীয় বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী ও সমাজকে একত্র করে এক নব জাতীয়তার স্বপ্ন দেখেছিলেন এই নব গোপাল। এই সময় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তার জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন—"ইউরোপীয় সমাজের সেই হোলি খেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অতিশিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদের ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলই আচারে ঢাকায় চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণ পরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপক রাগিনীতে আমাদের চমক লাগিয়া ছিল।"

বঙ্কিমের আবির্ভাব

এই সময়ের আর একটি ঘটনা যা বাঙ্গালী জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে সাহায্য করেছে সে সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

বঙ্কিমের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে দুই বিপরীতমুখী ধারা দেখতে পাই। গুপ্ত কবির মধ্যে আমরা দেখি পুরাতনের বাঁচিয়া থাকিবার করুণ আবেদন, আর মধুসূদনের মধ্যে দেখতে পাই নূতনের প্রকাশের মহাসমারোহ, বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই ধারার সমাবেশে নূতন সৃষ্টি। পুরাতনের মধ্যেই যে নূতনের স্থান আছে, নূতন যে পুরাতনেরই পরিণতি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রমাণ করলেন। যুগসন্ধির বিরোধ অন্তর্হিত হল, নবজীবনে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী বিশ্বে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হল। বঙ্কমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—বঙ্কিম বাবুর সৃজনীশক্তি মাতৃভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনের মজ্জার মধ্যে যে প্রবেশ করিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভাউৎসের ভাব প্রস্রবণ হইতে বাঙ্গালী জীবনরস প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্বে যেরূপ ছিল বঙ্কিমের আবির্ভাবের পরে বাঙ্গালীর জীবনের গঠনে যে তদপেক্ষা এক নূতন বৈচিত্র্য সঞ্চার হইয়াছে, তাহা এখনও আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই।"

কি ইংরেজী ভাবধারা প্রচারে, কি স্বদেশিকতা বা স্বাজাত্যবোধ সৃষ্টিতে ঠাকুরবাড়ী অনেকদিন থেকেই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রেখেছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকেই কলকাতায় সর্বপ্রকার আন্দোলনে ঠাকুর বাড়ী নেতৃত্ব করে আসছিল। নব গোপাল মিত্রও এই ঠাকুর বাড়ীর প্রভাবের মধ্যে থেকেই তার জাতীয় ভাবধারা প্রচার করছিলেন। যে সাপ্তাহিক 'নেশনাল পেপারে' নবগোপাল স্বদেশীভাব প্রচার করছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রাজনারায়ণ বসুর জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কথা পূর্বেই বলেছি। এই সভার জন্যই একটি অনুষ্ঠানপত্র রচিত হয়—**Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling**

among the educated natives of Bengal. এই অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করে নবগোপালের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হল। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সঙ্গীতাদির অনুশীলন এবং স্বদেশীয় কুস্তী প্রভৃতির পুনর্বিকাশের জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এর ফলেই ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে হিন্দুমেলা স্থাপিত হল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মেলায় সম্পাদক এবং নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। সহকারী সম্পাদকরূপে নবগোপালই সভায় যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। 'মেলা' কথাটি নবগোপালেরই দেওয়া।

হিন্দু বা চৈতমেলা

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ৩০শে চৈত্র মেলার প্রথম অধিবেশন হল। পরবর্ত্তী বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলায় দ্বিতীয়অধিবেশন হল বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে। এই দিনই "গাও ভারতের জয়" গানটি সুগায়কদিগের দ্বারা গীত হয়। গানের প্রথম দিকের পদগুলি এই—

মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মন প্রাণ, গাও ভারতের যশোগান
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান? কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী, শতখনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়।
কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়।......

গানটি সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের রচিত। সত্যেন্দ্রনাথ ভারতের প্রথম আই, সি, এস। এই গানটিকে ভারতের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত বলা চলে।

এই অধিবেশনেই মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করাই এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য। মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন যে ভারতীয়দের আত্মনির্ভর করাই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

হিন্দুমেলার কাজ চালাবার জন্য নেশানাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভৃতি সেই সময়ের কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মেলার বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার ভার নিলেন। ঐক্যবোধ বৃদ্ধি, সাময়িক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনের প্রায় সকল দিকেই এঁদেব দৃষ্টি ছিল। জাতীয় জীবনের সংগঠনকল্পে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রথম। আর এর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি নাট্যকার মনোমোহন বসু একথা সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করলেন। প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট তাঁর নাম চিরস্মরনীয়।

হিন্দুমেলার ৫ম অধিবেশনে ধনী ও ভূস্বামীদের সম্বোধন করে মনোমোহন বাবু বলেন, "হায়রে সৌভাগ্যশালী প্রিয় পুরুষগণ! * * * স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথপ্রদর্শক করো। তিনি অচিরে নির্ম্মল আনন্দ মন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। হায় বৎস! তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশা ভরসা অদ্যাবধি তোমাদের কনীয়ান ভ্রাতারা যেরূপ মাতৃভক্তি পরায়ণ, আর বাসনা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেরূপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি সেরূপ প্রভুত্ববল, সম্পদবল এবং সম্ভ্রমবল থাকিত, তবে বৎস! কোন চিন্তার বিষয়ই থাকিত না। * * *

অতএব আর ঔদাস্য নিদ্রায় অচেতন রহিবে না; জননীর দুঃখমোচনে আর বিলম্ব করিও না, জাগরুক হও, উত্থান কর, চক্ষুরুন্মীলন কর, পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও, স্বাবলম্বনরূপ বসন পরিধান কর, ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধর, আশারূপ আসাগাছটি করতলগত, ভ্রান্তি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হও—চাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে, স্বজাতিকুঞ্জে গৌরবশাখীকে ভর করিয়া কর্ত্তব্য কোকিল, উৎসাহ শুক, আর উত্তেজনা সারী জয় জয়ন্তী তালে গান ধরিয়াছে—নববাসর নবোত্তম কুসুমের যশঃ সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। নবোদ্ভিন্ন সুশিক্ষারূপ সুপক্ষধারী সুপবিত্রচেতা ছাত্রপুঞ্জ মধুকর শ্রেণীরূপে গুঞ্জরণ করিয়া কুঞ্জবনে আসিতেছে। আবার দৃষ্টিকর "সৌভাগ্য অরুণ" তরুণ বেশে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছে। তাহার শোভা দেখাইবার জন্য তোমাদের সকল ভ্রাতাকে একত্র কর। সেই অরুণের আশ্চর্য্য আলোক দেখিয়া এই ভারতবাসী সকলে শব্দ করুক— 'জয় জয় জয়!'

দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই ছিল হিন্দুমেলা কর্ত্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য। মেলার বারুইপুর অধিবেশনে মনোমোহন বসু বলেছিলেন—"শারদীয়া দেবীর ন্যায় এই উন্নতিদেবীও দশভুজা। তাঁহার ও দশহস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে। প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যানতত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থ হস্তে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য। উদ্যম নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া উন্নতিদেবী এই সব অস্ত্র দ্বারা দৈত্যপতি পরবশ্যতার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন। এর অর্থ এই যে, দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির উন্নতির মধ্য দিয়ে উন্নতি সাধিত হলেই দেশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারবে।

কিন্তু নব জাগ্রত যুব সমাজ এই দীর্ঘকালীন কর্ম্মসূচী মেনে দেশকে স্বাধীন করতে সম্মত নয়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নব্য বাঙ্গালীর নিকট পরাধীনতা তখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। তারা বন্ধনের নাগপাশ নিমেষে চূর্ণকরে জগতের অপরাপর জাতির সঙ্গে সমান আসনে বসতে দৃঢসংকল্প। দেশের সামাজিক উন্নতির জন্য যে শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়া প্রয়োজন এ তারা নিঃসংশয় বুঝে নিয়েছে তখন। তাই এরই আয়োজনে ব্যস্ত হল তারা। ইউরোপে ফ্রান্স ও ইতালীয় আদর্শ তখন তাদের সামনে। এই আদর্শ অনুসারেই ঠাকুর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হল সঞ্জীবনী সভা। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ ঋষি রাজনারায়ণের নেতৃত্বে। তরুণ মন দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কিন্তু তারা বুঝেছে এর সার্থকতার পথে ইংরাজ তাদের অন্তরায়। তাই সঞ্জীবনী সভা হল প্রথম গোপন সমিতি। সমিতির সভ্যদের গোপন ভাষায় এর নাম ছিল "হাঞ্চূ পামু হাফ"। এখানে আরম্ভ হল তরুণদের মন্ত্রগুপ্তির অভ্যাস। রাজনারায়ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ চিন্তানায়কগণ যুবকমনে এর প্রেরণা যোগাতে লাগলেন। কারণ তারাও বুঝেছিলেন—যে ইংরেজ অপরাধীর বিচারে এ দেশবাসীকে তাদের সঙ্গে সমানাধিকার দিতে সম্মত নয়, তারা ভারতকে স্বাধীন করে দিবেনা। দেশকে স্বাধীন করতে যে ইংরেজের বিরুদ্ধে একদিন অস্ত্র ধরতে হবে এ ধরণা ভারতবাসী চিত্তে স্থান পেয়েছে এ আমরা দেখতে পাই একটু আগেই। হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ৭ই শ্রাবণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে। এই সঙ্গীত প্রকাশিত হবার পরেই সমগ্র বঙ্গদেশে একটা বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

বাজরে শিঙ্গা বাজ এইরবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?

বঙ্গদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যান্ত এই সঙ্গীত ধ্বনিত হল। এই গানেই আমরা দেখি—

দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না হবে না খোল তরবার
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
পূজা যাগযোগ প্রতিমা অর্চ্চনা
এ সবে এখন কিছুই হবে না
তূণীর কৃপাণে করগো পূজা।

'অবলা বান্ধব' সম্পাদক দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বীরনারী প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে। তিনি দুঃখ করে গাইলেন—

সোণার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত সন্তান বক্ষঃ ভাসে অশ্রুধারে।
জ্ঞান রত্নাদির খনি সভ্যতার শিরোমণি
আজি সেই পুণ্যভূমি, ভাসে গভীর আঁধারে।

তিনি আরও বলেছেন,

ভারত শ্মশান হোক, মরু হয়ে পড়ে রোক,
তবু অধীনতা বেড়ী, রেখোনারে পায় ধরে।

যুবক বাংলাকে তিনি শুনিয়েছেন আশার বাণী—

কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী বিক্রমে নবীন,
রহিবেনা পুণ্যভূমি চিরপরাধীন।

পরাধীনতাকালিমা মোচন করবার জন্য তিনিও বাঙ্গালীকে অসি ব্যবহার করার উপদেশ দিয়ে গেছেন—

দ্বিজ হও ক্ষত্র হও বৈশ্য শূদ্র হও,
যে করেছো একদিন অসি ব্যবহার,
সেই করে অসি ভাজ নতুবা যবন হস্তে নাহিক নিস্তার।

রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়হে কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়হে কে পরিবে পায়।" মনোমোহন বসুর "দিনের দীন সবে দীন, ভারত হয় পরাধীন। অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনুক্ষীণ।" এলাহাবাদ প্রবাসী গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের,—"কত কাল পরে বল ভারত রে, দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে?" প্রভৃতি সঙ্গীতও যুবক মনে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই বাঙ্গালী যুবকদল সঞ্জীবনী সভা গড়ে তুলবার প্রয়াসী হয়েছিল।

সঞ্জীবনী সভা

এই সঞ্জীবনী সভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বদেশীদের দল। কলিকাতায় এক পোড়ো-বাড়ীতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সকল অনুষ্ঠান রহস্যাবৃত ছিল। * * * এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ ছিল উত্তেজনার আগুন পোয়ানো।"

যে পোড়ো বাড়ীতে সভা বসত তার অবস্থিতি ছিল ঠনঠনিয়ায়। বাড়ীর মালিক কে তা কেউ জানতনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এই সভা সম্পর্কে আছে—"সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তার মধ্যে প্রধানই ছিল মন্ত্রগুপ্তি। অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তা অসভ্যদের নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও ছিলনা। * * * আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসান ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতিদুইটি জ্বালাইবার এই অর্থ যে, মৃত ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এব্যাপারে ইহাই মূল কল্পনা। * * * সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—"সংগচ্ছধ্বম সংবদধ্বম"। ইহার দীক্ষানুষ্ঠানে এক ভীষণ গাম্ভীর্য্য ছিল। দীক্ষাকালে নবদীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ অজ্ঞাত ভাবাবেগে শিহরিয়া উঠিত।"

সভার কার্য্যবিবরণী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত এক গুপ্তভাষায় লেখা হইত। এই ভাষায় ঐ সঞ্জীবনী সভার নাম ছিল—"হাঞ্চু পামু হাফ।"

ইতালীয় আদর্শের প্রভাব

ইতালীতে ম্যাটসিনি ও গারিবল্ডি দেশ উদ্ধারের জন্য গুপ্ত কারবোনারি আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। তারই বিস্তৃত বিবরণ এদেশে এসে পৌঁছাতে শিক্ষিত যুবকসমাজ দেশকে নব্য ইতালীয় ছাঁচে গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ হল। এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"আমরা অষ্ট্রিয়ার অধীন ইটালিয়ানদের অবস্থা ও বৃটিশ আমলে

আমাদের নিজেদের অবস্থার মধ্যে বহুলাংশে সমতা দেখতে পেলাম। আমাদেরও মফস্বল অঞ্চলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হলে ভারতীয়রা কোনরূপ ন্যায় বিচারই পায় না। একই সিবিল সার্ভিসের ভারতীয় ও ইউরোপীয় অংশের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য আমাদের হৃদয়ে জ্বালা বাড়িয়ে দিত। আসাম চাবাগানের কুলীদের দুর্দশা তখন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা ম্যাজিস্ট্রেটী জুলুমের কাহিনী প্রায়ই প্রকাশ করতেন। এই সকল ব্যাপারে ম্যাটসিনি পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ আমাদের তিক্ত মনকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেললে। আমরা ম্যাটসিনির লেখা ও যুবক ইতালীয় আন্দোলনের ইতিহাস পড়া আরম্ভ করলাম। আমরা তখন ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি, বিশেষভাবে কারবোনারি প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ম্যাটসিনি প্রথমে কারবোনারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে ইতালীতে যে সব গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তারই নাম এক-কথায় কারবোনারি। কারবোনারির গুপ্ত পদ্ধতি সভ্যদের মধ্যে প্রকারান্তরে ভীরুতারই প্রশ্রয় দিত। এজন্য ম্যাটসিনি পরে এর সম্পর্ক ত্যাগ করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনি সম্পর্কিত বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় লেগে গেলাম। কিন্তু তখনও কোনরূপ বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা আমরা চালিত হইনি বা স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্য কোনরূপ গুপ্তহত্যার কথাও ভাবিনি। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এইরূপ বহু গুপ্ত যুবসমিতির অধিনায়ক ছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনরূপ নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম যুবকদের ছিলনা বটে কিন্তু তাঁরা আদর্শে নিষ্ঠাবান ছিলেন। আমি একটি সমিতির কথা জানি—আমি

অবশ্য এর সভ্য ছিলাম না, যার সভ্যগণ তরবারি অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল ছিন্ন করে রক্ত বার করতেন ও এই রক্ত দিয়ে অঙ্গীকারপত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন।"

এদেশীয় ইউরোপীয় সমাজের প্রকোপে পড়ে সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ তখন প্রকাশ্যভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনিই ছাত্রসমাজকে ইতালীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুললেন। প্রকাশ্য সভায় অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি বললেন—"I am an avowed disciple of Mazzini and Garibaldi." ইংরেজী ভাষা যারা জানেনা, তারাও যাতে ইতালীর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় জানতে পারে, এজন্য তিনি যোগেন্দ্রবিদ্যাভূষণকে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবন কাহিনী বাংলা ভাষায় রচনা করতে বলেন। গোপন সমিতির এই বিপ্লবী যুবকদলের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি হুগলীর বহুস্থানে কুস্তি ও লাঠিখেলার আখড়া স্থাপন করেছিলেন।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা

এইভাবে যুবক ও ছাত্র সমাজ মিলে নানাস্থানে গুপ্তসমিতি গড়ে তুলতে লাগল। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আদর্শ নিষ্ঠা ও স্বাধীন চিন্তাধারার জন্য ছাত্রসমাজের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। প্রধানতঃ তাঁরই নেতৃত্বে সেই সময়ের কলকাতার ছাত্রসমাজের মেধাবী তরুণ বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরী মোহন দাস, কালী শঙ্কর সুকুল, তারা কিশোর রায় চৌধুরী (পরে ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী) প্রভৃতি মিলে একটি নূতন সমিতি স্থাপন করেন। ১৮৭৬

সালের মাঝামাঝি এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই সমিতি ঠাকুরবাড়ীর সঞ্জীবনী সভারই সমসাময়িক এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর নিয়মপদ্ধতি আরও একটু চাঞ্চল্যকর ছিল। সমিতির সভ্যদের অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে অগ্নি সাক্ষী করে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হত। সভা প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে একদিন মধ্যরাত্রে শিবনাথের ভবনে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ কবতে করতে সমিতির সভ্যগণ দেশকে স্বাধীন করার আজীবন ব্রত পালন অঙ্গীকার করেন। তারা অঙ্গীকার করেন যে, জীবন গেলেও কেউ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব করবেন না। কারণ তাদের মতে বৃটিশ জাতি বল প্রয়োগে ভারতবর্ষ অধিকার করেছে। শিবনাথ তখন সরকারের কাজ করছেন বলে অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতে পারেননি। কিন্তু এর কিছুকাল পরেই তিনি কর্মত্যাগ করেন। অনুষ্ঠানের নিয়ম এই ছিল যে কয়েকটি প্রতিজ্ঞা একখানি কাগজে লিখে বক্ষরক্তে তাতে স্বাক্ষর করে দীক্ষার্থী সভ্য অগ্নি প্রদক্ষিণ করে কাগজখানি ঐ অগ্নিতে অর্পণ করবেন। অন্যান্য প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটি প্রতিজ্ঞা এই ছিল যে 'স্বায়ত্ত শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃ নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি। তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আইন কানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র এবং দুর্দ্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও আমরা এই গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব স্বীকার করিবনা।" অন্য একটি প্রতিজ্ঞায় ছিল— "আমরা অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি নিয়মিত অভ্যাস করিব ও অপরকে অভ্যাস করিতে প্রনোদিত করিব।" এই সময়ে তারা জাতিভেদকে অস্বীকার করা, লোকশিক্ষা প্রচার করা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্জনেরও প্রতিজ্ঞা করেন। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"যখন ইঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন

করিতে করিতে 'আগুনের' চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন এক আশ্চর্য্য বল, আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে নাচিতে লাগিল।"

ওয়াহাবী আন্দোলন

সিপাহী বিদ্রোহের সময় একশ্রেণীর মুসলমান দিল্লীর সম্রাটকে পুনরায় সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেছিল। তাদের চেষ্টা সফল হয়নি বরং বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পরে এই সমস্ত মুসলমানদের ইংরেজহস্তে বহুভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। এদিকে স্যার সৈয়দ আহম্মদ প্রমুখ যে সকল মুসলমান বিদ্রোহের সময় ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন বিদ্রোহজয়ী ইংরেজ এদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হল। এর ফলেই উত্তরভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সৃষ্টি হল। সরকারের মতে ওয়াহাবীরা বৃটিশকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তগত করতে চেয়েছিল। এ আন্দোলনকে দমন করবার জন্য ইংরেজ বদ্ধপরিকর হলেন। ১৮৭১ সাল ওয়াহাবী নেতা আমীর খাঁকে ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে বন্দী করে যাবজ্জীবনের জন্য নির্বাসিত করা হল। প্রকাশ্য আদালতে তার বিচার করবার জন্য এক আবেদন করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন পেণ্টন নরম্যানের আদালতে এর শুনানী হয়। নিজেদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য ওয়াহাবীরা বোম্বাই হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ অ্যানিষ্টিকে নিয়োগ করেন। মিঃ অ্যানেষ্টি আদালতে তাঁর বক্তৃতায় লর্ড মেওর শাসনকালের অনেক অনাচার অবিচার উল্লেখ করেন। ওয়াহাবীরা এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করে বিলি করে। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, যৌবনে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করে যেন মেতে উঠেছিলাম।

এর কিছুপরেই ১৮৭১ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতি নরম্যান যখন টাউনহলের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন, আব্দুল্লা নামক এক আততায়ী তাঁকে ছুরি কাঘাত করে। তিনি রাত্রিতে মারা যান। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বিচারে আব্দুল্লার ফাঁসী হলে তারা তার মৃতদেহ কবর না দিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন। এর অল্প কিছুদিন পরে ১৮৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী লর্ড মেও যখন আন্দামান জেল পরিদর্শন করছিলেন, শের আলী নামক আফগানের ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন। এই দুর্ঘটনা ওয়াহাবীদের কাজ বলে সরকার মনে করে। এর পরে সরকার নির্মমহস্তে এই আন্দোলন দমন করেন।

সিভিল সার্ভিসে বৈষম্য

ভারত শাসনে এদেশীয়দের অধিকার ১৮৩৩ সালের সনদেই স্বীকৃত হয়েছিল। এর কয়েক বৎসর পর এই স্বীকৃতি অনুযায়ী কয়েকজনকে ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছিল তা আমরা দেখেছি। কিন্তু জিলা শাসনের ভার কোন ভারতীয়ের উপর পড়বে এ যেন ইংরেজ বা ভারতীয় সকলের কাছেই ছিল কল্পনাতীত। ১৮৫৩ সালের সনদে সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক করা হয়। প্রতিযোগীদের বয়স ২৩ বছরের বেশী হবেনা বলে স্থির হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নিয়মানুযায়ী ২ বৎসর পড়াশুনা ও শিক্ষানবিশী করতে হত। ১৮৫৯ সালে এই নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত হয়। এই সময় স্থির হয় যে পরীক্ষার্থীর বয়স অনূর্দ্ধ ২২ বৎসর হবে এবং শিক্ষানবিশী কাল হবে একবৎসর। এর ৪ বৎসর পরে প্রতিযোগীদের বয়স আরও এক বৎসর কমিয়ে ২১ করা

হয় এবং শিক্ষানবিশীকাল ২ বৎসর করা হল। প্রথম থেকেই পরীক্ষায় সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় নম্বর ছিল ৩৭৫ এবং গ্রীক ও লাটিন ভাষার জন্ম নম্বর ছিল ৭৫০। ১৮৫৯ সালে প্রাচ্য ভাষার নম্বর বাড়িয়ে ৫০০ করা হয়। কিন্তু ১৮৬৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সমস্ত অসুবিধা সত্বেও উত্তীর্ণ হলেন, পরীক্ষার নম্বর পুনরায় আগের মত করা হল। ফলতঃ এই সব কারণে পরীক্ষা নামে প্রতিযোগিতামূলক হলেও ভারত-বাসীদের প্রতিযোগিতা করবার বা প্রতিযোগিতা করে উত্তীর্ণ হবার কোন আশা রইলনা। একেত বিলাতযাত্রা তখন সমাজে নিষিদ্ধ ছিল, এর পরে এত অল্পবয়সে কোন ভারতীয়ের বিলাতে গিয়ে পরীক্ষা দিবার সম্ভাবনা ছিলনা। যারা এই বাধা অতিক্রম করে পরীক্ষা দিতে সমর্থ হবেন, প্রতিযোগিতায় তাদেরও সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। ১৮৬০ সাল থেকে ১০ বৎসরে ১৬ জন ভারতীয় পরীক্ষা দেন কিন্তু একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ১৮৬০ সালে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল কমিশন একই সময়ে ভারতেও পরীক্ষা নেবার সুপারিস করেছিলেন। কিন্তু এ অনুসারে কাজ কখনও হয়নি। এসব কারণে শিক্ষিত ভারতীয়দের অন্তরে বিক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছিল। এর উপর ১৮৭৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী ভারত সচিব লর্ড সলিসবেরীর নির্দেশে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়স কমিয়ে একেবারে ২০ করা হল। শিক্ষিত ভারতবাসী এতে প্রমাদ গণলেন। তাদের উচ্চাশার পথ এইভাবে বন্ধ হতে দেখে তারা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। উচ্চ রাজপদে ভারতীয়দের নিয়োগ যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিলনা এবং সিভিল সার্ভিস থেকে ভারতীয়দের যতদূর সম্ভব দূরে রাখবার জন্যই যে নিয়ম করা হয়েছিল ভারত সচিবের নিকট লিখিত লর্ড লিটনের এক গোপন পত্র হতে তা' জানা যায়। লর্ড লিটন লিখেছিলেন—

ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের দাবী পূরণ করা আদৌ সঙ্গত নয়। কাজেই তাদের এদাবী অস্বীকার করা বা তাদের প্রবঞ্চনা করা— এ দুটির একটি পথ আমাদের বেছে নিতে হবে। আমরা দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছি। প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা বিলাতে করা এবং পরীক্ষা দিবার বয়স হ্রাস করা আইনকে অকেজো করারই কৌশল মাত্র।"

জনমত গঠন

১৮৭৬ সালের নূতন নিয়মের প্রতিবাদে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হল। এ ব্যাপারে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই এতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন যে কেশবচন্দ্র প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারক ও ধর্মপ্রচারক হলে তিনিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায়ই স্থির হল যে সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে ভারতীয় জনমতকে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলবেন। সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ তখন বাংলা দেশে প্রকাশ্য ও গোপন আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। সামান্য কারণে তাকে যেভাবে পদচ্যুত করা হয়েছিল তাতেও শিক্ষিত সমাজের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। সভার নির্দেশ অনুসারে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালের মে জুন মাসে বাঁকিপুর. এলাহাবাদ, আগ্রা, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, মীরাট, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, বারানসী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে সমগ্র উত্তর ভারতের শিক্ষিত সমাজকে এ বিষয়ে অবহিত করবার চেষ্টা করেন। এরপর ১৮৭৮ সালে তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়েই বোম্বাই, সুরাট, আমেদাবাদ, পুনা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে মাদ্রাজ হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন

করলেন। সমগ্র ভারতের জনগণ সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিল। এর কয়েক বছর পরে সমগ্র ভারতবাসীর যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখানেই তার সূচনা। এর আর একটি ফল এই হল যে সুরেন্দ্র নাথ গোপন আন্দোলনের নেতৃত্ব ত্যাগ করে প্রকাশ্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং এই প্রকাশ্য আন্দোলনেই সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন! কিন্তু এতদিন ধরে যে গোপন আন্দোলনে তিনি যুবক সমাজকে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন, এখানেই তার সমাপ্তি ঘটলনা। কয়েক বৎসর স্তিমিত থাকার পর আন্দোলন নূতন নেতৃত্বে এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হল। ফলতঃ কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন যুবক সমাজের চিত্তকে কখনই আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই গোপন আন্দোলনের ধারাটি কংগ্রেসের প্রকাশ্য আন্দোলনে অঙ্গীভূত না হয়ে ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করছিল। সমগ্র ভারতব্যাপী বিপ্লবের স্বপ্ন তাদের সফল হয়নি, বারবার প্রকাশ্য আন্দোলনের আঘাত এসে তাদের পঙ্গু করে দিয়েছে, কিন্তু যে অপরিসীম সংগঠন শক্তির পরিচয় এরা দিয়েছে তাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলেনা। প্রকাশ্য আন্দোলনের প্রায় সমস্তরেই গোপন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান প্রায় সকল প্রদেশেই গড়ে উঠেছিল, আর এর শক্তিও যে নেহাৎ কম ছিল তা নয়। বিভিন্ন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে না হউক, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা রেখে কাজ করলে তাদের ভারতব্যাপী বিপ্লবের স্বপ্ন হয়ত ব্যর্থ নাও হতে পারত।

প্রথমে জাতীয় সম্মেলন এবং পরে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সুরেন্দ্রনাথ গোপন আন্দোলন থেকে সরে গেলেও এর সংস্রব তিনি যে একেবারে ত্যাগ করেছিলেন তা মনে হয় না। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী প্রেরিত হল মজফরপুরে। শুনা যায় কিংসফোর্ডের মৃত্যু-

দণ্ডাদেশে যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ একজন। অপর দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন হলেন শ্রীঅরবিন্দ, অন্য ব্যক্তি রাজা সুবোধ মল্লিক। গদর দলের বিপ্লবী শিখগণও এসে প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি তাদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন এবং বলেন যে বাংলা দেশ যথাসময়ে এ আন্দোলনে সাড়া দিবে।

অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা

ঠাকুর বাড়ীর সঞ্জীবনী সভা এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গুপ্ত সমিতি এবং এর উদ্দেশ্য দেশের স্বাধীনতা অর্জন হলেও এরা সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন তখনও দেখতে আরম্ভ করেনি। গুপ্ত সমিতি সশস্ত্র বিপ্লবী দলে পরিণত হয় আরও পরে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরে আন্দোলন যখন প্রকাশ্য পথ ধরল গুপ্ত সমিতিগুলি অনেকটা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৫।২০ বৎসর গুপ্ত সমিতির একপ্রকার অস্তিত্ব ছিলনা বললেই হয়। সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ম্যাটসিনি ও গারিবল্ডীর জীবনী হতে যারা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। মেদিনীপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে কতকটা সফল হবার পরে প্রমথনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পুনরায় কলকাতায় এসে বসলেন। কলকাতার সেযুগের সংস্কৃতিকেন্দ্র বলে, ঠাকুর বাড়ীতে পূর্ব থেকেই তার যাতায়াত ছিল এবং সেই সূত্রে সঞ্জীবনী সভার সঙ্গে সংযোগ ছিল। জাপানী চিত্রশিল্পী ওকাকুরা এই সময়ে ভারতে আসেন। তিনি কলকাতায় পদার্পণ করলে তাঁর অভ্যর্থনা হয় ঠাকুর বাড়ীতে। ওকাকুরা এদেশের সাহিত্যিকগণের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে প্রমথনাথ ও

তেঘরিয়ার শশিভূষণ রায়চৌধুরীর উপর ভার পড়ে সাহিত্যিকদের ডেকে আনবার। তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রবীণ যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ উভয়েই এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতীয়গণ বিশেষতঃ, সাহিত্যিকেরা নিশ্চেষ্ট কেন ওকাকুরা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদের প্রশ্ন করেন—ভারতের অতীত মহান ঐতিহ্য সত্ত্বেও আজ এদেশ পরাধীন কেন? উপস্থিত সাহিত্যিকদের নিশ্চেষ্টতার জন্য তিনি তাদের মৃদু ভর্ৎসনা করেন। এ ভর্ৎসনা আর কাউকে আঘাত না করলেও প্রথমনাথকে আঘাত করেছিল। তিনি পরে ওকাকুরার সঙ্গে এ নিয়ে আরও আলাপ আলোচনা করেন। এর ফলেই (১৯০০—১৯০২) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাঁর বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হল! সমিতির প্রথম পত্তন ঠাকুর বাড়ীতেই হল। এর সভাপতি হলেন প্রমথনাথ, সহসভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস এবং কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভগিনী নিবেদিতাও এদলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অগ্নি-যুগের সাগ্নিক বারীন্দ্র কুমার বলেছেন—১৯০৩ সালের প্রবর্ত্তিত আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতা ছিল আমাদের কাজে নিত্য সঙ্গিণী। ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি সার্কুলার রোডে উঠে যায়। এই সময় থেকেই যথার্থ বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানরূপে সমিতির আরম্ভ বলা যায়।

অনুশীলন সমিতি নামটি প্রমথনাথেরই দেওয়া। তিনি বঙ্কিম সাহিত্য হতে নামটি গ্রহণ করেছিলেন। প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে পনেরো বৎসরের ছোট ছিলেন। কিন্তু উভয়েই ছিলেন নৈহাটির অধিবাসী। প্রবীণ ও নবীন অনেক সময় বন্ধুর মতোই মেলামেশা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এসেছিলেন প্রমথনাথকে শুনাবার জন্য তারই গৃহে। বঙ্কিমচন্দ্রই পড়ে শুনালেন, এর পরে

দুজনের মধ্যে আলোচনা চলল এ নিয়ে। আলোচনা করতে করতে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবাবেগে বলে উঠলেন—এমন একদিন আসবে যেদিন সমগ্র ভারতবর্ষে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি গীত হবে। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষির এ বাণী মিথ্যা হয় নাই।

হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সর্বজন বিদিত। এ মত বয়ঃকনিষ্ঠ এবং স্নেহভাজন প্রমথনাথকে প্রভাবান্বিত করে থাকবে তা বিচিত্র নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই উপন্যাসে তিনি লাঠি প্রশস্তি লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করেছেন, "বাঙালীর হাতের লাঠি একদিন কত. তরবারি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, কত ঢাল খাড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, বন্দুক আর সঙ্গীন যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। লাঠি একদিন বাংলার আব্রু পরদা রাখিত, মান রাখিত, ধন রাখিত, প্রাণ রাখিত, সবার মন রাখিত।" কিন্তু বাঙ্গালীর হাতের সেই লাঠি আর "লাঠি নেই, সে বংশখণ্ড মাত্র" বলে বঙ্কিমচন্দ্র খেদ করেছেন।

১৯০২ সালে আমরা বেঙ্গলী পত্রিকায় 'লাঠি' সম্পর্কে প্রথমনাথের প্রবন্ধ দেখি—

The lathi is the national weapon of Bengal. A Bengalee lathial, properly trained, can with his single lathi keep half a dozen swordsmen away.

It is a healthy outdoor exercise As an art of offence and defence it combiness in itself the skill required in the bayonet exercise and sword exercise. * * * we should be unwise if we allow it to die away from our midst.

বাল্যকাল হতেই প্রমথনাথ লাঠিখেলার অনুরাগী ছিলেন। এই সময়ে ভদ্রবংশে লাঠি খেলার প্রচলন ছিলনা। লাঠির যা কিছু প্রচলন ছিল তা সমাজের নীচ শ্রেণীর মধ্যে। জমিজমা রক্ষা করবার জন্য ভদ্রলোকেরা এই নীচশ্রেণীর মধ্য থেকেই লাঠিয়াল সংগ্রহ করতেন। প্রমথনাথের পিতা ছিলেন একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, রাজসরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। প্রমথনাথের মাতামহ ডাঃ বিপ্রদাস দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম-বি এবং একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। সুতরাং প্রমথনাথের ন্যায় অভিজাত সমাজের ছেলের পক্ষে লাঠি খেলায় অনুরাগী হওয়া স্বাভাবিক ছিলনা। কিন্তু মাত্র ১২ বছর বয়সে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের সমসাময়িককালে প্রমথনাথ লাঠিখেলায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। রাজকার্য্যোপলক্ষে পিতা নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। বালক ভুলী বাড়ীতে মাতার কাছে থাকত। বালকের লাঠিখেলার প্রতি অনুরাগ দেখে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা প্রমাদগণলেন। ১৮৫৩ সালের কালী পূজায় অমাবস্যা রাত্রিতে প্রমথনাথের জন্ম। সবার মনে হল বালক বড় হলে ডাকাতদলের সর্দার হবে। ফলে মাতার আদেশে প্রমথনাথের লাঠি খেলা বন্ধ হল। পিতা বিপ্রদাসবাবু বাড়ীতে এসে এখবর জানতে পেরে স্ত্রীকে বুঝিয়ে পুনরায় পুত্রের লাঠি খেলায় অনুমতি করলেন। প্রমথনাথ সদলবলে আবার লাঠিখেলা আরম্ভ করে দেয়।

লাঠি খেলার প্রতি প্রমথনাথের এই আকর্ষণ বার্দ্ধক্যেও কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। যুবকদের মধ্যে তিনি লাঠিখেলার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন—ইংরেজের কাছে যেমন মুষ্টিযুদ্ধ, স্পেনদেশীয়র কাছে যেমন অসি, ফরাসীর কাছে যেমন কুস্তী, বাঙ্গালীর কাছেও তেমনই লাঠিখেলা। অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে প্রমথনাথ

বাংলায় এই জাতীয় হাতিয়ারকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। প্রমথনাথের এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। এজন্য প্রমথনাথ যাদের সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কলকাতার সতীশচন্দ্র বসু এবং ঢাকার পুলিন পুলিন বিহারী দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রমথনাথের এই লাঠিখেলার মূলে যে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের এ অনুমান অভ্রান্ত বলে মনে হয়।

ম্যাটসিনি এবং গারিবল্ডির আদর্শে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলবার প্রেরণা পান তিনি সুরেন্দ্রনাথের নিকট। দুজনে বোধহয় একসঙ্গেই বিলেতে ছিলেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার সময়। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে ১৮৬৮ সালে প্রমথনাথ বিলেতে যান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে। কিন্তু সস্কৃত পরীক্ষার দিনে আমাশায় অসুস্থ হয়ে পড়াতে পরীক্ষা দিতে পারেন নি। এরফলে পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য্য হতে পারলেননা। বয়স থাকা সত্বেও দ্বিতীয়বার পরীক্ষা না দিয়ে ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরলেন। বিলেতের সূত্রেই হোক বা অন্য সূত্রেই হোক প্রমথনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে জানাশুনা ছিল। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় এসে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, প্রমথনাথ তখন ব্যারিষ্টারী করছেন সুদূর বরিশালে এবং সেখানে পসারও তাঁর কতকটা জমেছে। তিনি তখন বরিশাল বার এসোসিয়েশনের সভাপতি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাকে কলকাতায় ডেকে নিয়ে এলেন। কলকাতায় এসে প্রমথনাথ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত রিপণ কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) তিনি অধ্যাপনাও করতে থাকেন। কলেজে তিনি আইন ও আর্টস বিভাগে পড়াতেন। বেঙ্গলী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় তিনি মাঝে মাঝে পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন। লাঠিখেলা সম্পর্কে যে প্রবন্ধের

কথা পূর্বে বলা হয়েছে উহা বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। সুতরাং আমরা দেখি, স্বাধীনতা আন্দোলনের গোপন ও প্রকাশ্য এই দুই ধারার নেতৃত্বের মধ্যে একটি ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। প্রকাশ্য আন্দোলনে প্রমথনাথ কোনদিনই যোগ দেন নাই। গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা এবং তার মধ্যদিয়ে বাংলা দেশে লাঠি খেলার পুনঃ প্রবর্ত্তন এই কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বাঙ্গালীকে সামরিক জাত হিসাবে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রমথনাথের মধ্যে প্রবল ছিল। বাঙ্গালীর অস্ত্রধারণের অধিকার নেই এ ক্ষোভ তখন অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীরই ছিল। বিলেতে অধ্যয়নকালে প্রমথনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করবার চেষ্টা যত না করেছিলেন তার চেয়ে অধিক চেষ্টা করেছিলেন সেনা বিভাগে প্রবেশলাভ করবার জন্য। এ নিয়ে তিনি ইণ্ডিয়া অফিসেও কিছুদিন ছুটাছুটী করেছেন। কিন্তু বাঙ্গালী সামরিক জাত নয় এই কারণে তাঁর আবেদন নামঞ্জুর হয়ে যায়। এর পরে তিনি ফরাসী ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি প্যারী পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু ফরাসী নাগরিক নন বলে তাঁর এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

মারাঠাদেশে বিপ্লবপ্রচার

প্রকৃতপক্ষে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই বাংলাদেশে যথার্থ বৈপ্লবিক কর্মধারা আরম্ভ হয়। এই বৈপ্লবিক ভাবধারা বাংলাদেশে যেরূপ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল, বোম্বাই প্রদেশেও প্রায় একই সঙ্গে অনুরূপ ভাবেই বৈপ্লবিক মনোভাবের বিকাশ আরম্ভ হয়। বাংলার ন্যায় বোম্বাইতেও ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হ'তে ১৯০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত

এই ৩০ বৎসর ছিল বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালাবার সমিধ সংগ্রহের যুগ। রানাডের নেতৃত্বে সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৭১ খৃঃ অব্দে এবং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুঙ্কারের 'নিবন্ধ মালা' প্রকাশিত হল। স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক এই সকল প্রবন্ধে নিবন্ধকার দেশবাসীকে স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। এর ফল ফলতে বিলম্ব হল না। ভারতে ইংরেজবিদ্বেষ মহারাষ্ট্র দেশেই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করল। দেশকে স্বাধীন করবার জন্য মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর অনুকরণে পার্বত্য জাতিদের সঙ্ঘ বদ্ধ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মারাঠা বীর যুবক বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ফাড়কের বিদ্রোহ চলে। মারাঠা বীর যুবক স্থান হতে স্থানান্তরে গিয়ে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। তিনি নিজে লুকিয়ে থাকতেন এবং সুবিধা হলেই দলবল নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতেন। কিন্তু দু'বছরের অধিককাল তিনি এই সংগ্রাম চালাতে পারেননি। ক্রমে তিনি হীনবল হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে ধরা পড়ে এজন্য নির্বাসিত হন। ফাড়কে সেখান হতেও একবার পালিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয়নি। ফাড়কের বিদ্রোহ দমন করা হল বটে কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব হল না। দেশপ্রেম এবং ইংরেজ বিদ্বেষ অচিরেই সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে ছড়িয়ে পড়ল। বাংলাদেশে হিন্দু মেলা একদিকে যেমন জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করছিল এবং শরীর চর্চ্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে ক্ষাত্র শক্তির প্রতি অনুরাগী করছিল, মহারাষ্ট্র দেশে সেই এক উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয়েছিল সার্বজনিক গণপতি উৎসব। এই উৎসবে অসিচালনাও শিক্ষা দেওয়া হত। দশ দিন ধরে উৎসব চলতো, এই সময়ে যুবকদল রাজপথে ইংরেজ বিরোধী গানগেয়ে বেড়াত। ১৮৯৫ খৃঃ

অব্দে শিবাজী উৎসব আরম্ভ হল। শিবাজীর মুকুট ধারণের দিনের স্মারক হিসাবে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত।

চপেকার সংঘ

মহারাষ্ট্রে এই সমস্ত আন্দোলনের নেতা ছিলেন দামোদর হরি চাপেক্যার ও তাঁর ভ্রাতা রামকৃষ্ণ হরি চাপেক্যার। হিন্দু ধর্মের প্রতি-বন্ধক নাশক সমিতি নামে এক সমিতি করে এঁরা যুবকদলকে গোপনে সামরিক কৌশল শিক্ষা দিতে থাকেন। এঁদের এই গুপ্ত সমিতিই পরে চাপেক্যার সঙ্ঘ নামে পরিচিত হয়।

শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদা কলেজের অধ্যাপক তিনি এই চাপেক্যার সঙ্ঘের সম্পর্কে এসে বিপ্লব ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দ হতে ১৯০৬ এই ১০ বৎসর তিনি বরোদায় ছিলেন। শেষ দিকে ৭৫০৲ টাকা বেতনে তিনি কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। শ্রীঅরবিন্দ প্রভাবে আর ও দুইজন বাঙ্গালী যুবক এখানে বিপ্লব ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। উত্তর কালে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে এই দুইজনই বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন অগ্নিযুগের সাগ্নিক ঋষি বারীন্দ্র এবং অন্য ব্যক্তি যতীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি আজ বাংলা দেশে সুপরিচিত কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম হয়ত অনেকেই জানেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আর একটি ঘটনা বিপ্লবী বাংলার নব-জাগরণে সাহায্য করেছিল—সে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। আমরা দেখেছি, একদিন পাশ্চাত্য মিশনারী সমানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজও প্রচার করেছিল—Crystallised immorality and Hinduism are the same thing, এতে না ছিল তাদের লজ্জা,

না ছিল তাদের অপমান। কিন্তু সুখের বিষয় এ অবস্থা বেশীদিন চলেনি,-প্রতিবাদ এল রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্মের নিকট হতে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার হঠাৎ ঝলকে হিন্দুত্বের প্রতি শ্রদ্ধার গ্রন্থি তখন শিথিল হয়ে গেছে সবার মনে। তাই রামমোহন একে পাশ্চাত্য মতানুকূলে সংস্কার করে নিলেন। বেদান্তকে তিনি একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্রাহ্মধর্ম যে মূর্ত্তিপূজার কঠোর বিরোধী, সে খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবের ফল। তবুও ব্রাহ্মধমের ভিতর দিয়ে রামমোহন পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন, সেদিনের ভারতীয় সমাজের উপর তার সুনিশ্চিত ফল ফলতে দেরী হয়নি। ১৮২১ খৃঃ অব্দে খৃষ্টান মিশনারী উইলিয়ম আডাম রাম-মোহনের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করলেন, রামমোহনের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখা মেনে নিলেন। দু'দিক দিয়েই এর সুফল ফলল। হিন্দুর হিন্দুত্ব যে পাশ্চাত্য মনীষীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে, এ ধারণা সেদিন সমাজের কারও ছিলনা। তাই এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনলো হিন্দুত্বের প্রতি, আবার খৃষ্টান মিশনারী-গণও বুঝলেন যে পৌত্তলিকতাই হিন্দুধর্মের ভিত্তি নয়। কিন্তু রাম-মোহন প্রমুখ সংস্কারবাদীদের দ্বারা হিন্দুধর্মের এই রূপ পরিবর্ত্তনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন পুরাতনপন্থীরা। ১৮২৯ সালে ব্রাহ্মসভা স্থাপিত হল রামমোহনের নেতৃত্বে এবং এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে স্থাপিত হল ধর্মসভা। প্রাচীন হিন্দু আচার, হিন্দু ব্যবহার, হিন্দু রীতিনীতি অভ্রান্ত—এ-ই প্রচার করতে লাগলেন দ্বিতীয় দল। খৃষ্টধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন এঁরা।

বাংলায় সমাজবিপ্লব

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে তখন চলছিল সমাজ বিপ্লব। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করেছিল। স্বাধীনতার নামে বাঙ্গালী সেদিন শিখেছিল উচ্ছৃঙ্খলতা, তাই অখাদ্য ভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতিকেই সেদিন তারা মনে করেছিলেন সংস্কার, আর যা কিছু প্রাচীন তাই-ই ছিল তাদের নিকট কুসংস্কার। এইজন্য এই সকলের বিরুদ্ধেই ছিল আক্রমণ। প্রাচীন হিন্দুরা সেদিন এই আক্রমণের বিরুদ্ধেই আশ্রয় পেয়েছিল ব্রাহ্মধর্মের নিকট। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিদ্যুতালোকে বিভ্রান্তদৃষ্টি বাঙ্গালী সেদিন চেয়েছিল পশ্চিমের দিকেই। তার পূব গগনে যে নবারুণের উদয় হচ্ছে, আকাশ যে ছেয়ে গেছে লাল রংএ তার প্রতি দৃষ্টি তাদের ছিলনা। তাই রামমোহনের নিকট শিক্ষিত সমাজ যেদিন শিখল যে পাশ্চাত্য মতবাদ রয়েছে তারই ঘরে, তারই বেদান্তর মধ্যে—বাঙ্গালী সেদিন যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা হীন নয়, এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে এক নূতন শক্তির সঞ্চার করল। নূতন করে সমাজ সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হল তারা।

শিক্ষিত বাঙালী মাত্রকেই সেদিন ব্রাহ্মধর্ম টেনেছিল তার আবেষ্টনীর মধ্যে। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে ব্রাহ্মধর্ম এর ফলে অচিরেই শক্তিশালী হয়ে উঠল। হিন্দুসমাজ হতে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি যোগ দিতে লাগলেন এ সমাজে। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ২০ জন বন্ধু সহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন এবং এর প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। একার্য্যে তার সহায় ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঋষি রাজনারায়ণ বসু। এ আঘাতে সমগ্র

হিন্দু সমাজ হয়ত ভেঙে পড়বে আশঙ্কা তখন দেখা দিল সমাজের মধ্যে। ব্রাহ্মধর্ম একদিন সমগ্র ভারতের ধর্ম হবে, এ আশা স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের ও ছিল। মহর্ষির এ স্বপ্ন হয়ত একদিন সফল হতেও পারত যদি সেদিন প্রাচীনপন্থীরাও সংস্কারভাবাপন্ন না হতেন। এই প্রবল আঘাত থেকে সমাজকে সেদিন যারা রক্ষা করেছিলেন তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মতবাদে প্রাচীনপন্থী হয়েও তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ নিবারণ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র হতে যুক্তি সংগ্রহ করে এই সংস্কারের পক্ষে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। এই সংস্কারের ঢেউ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজেও পৌছল। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধু বান্ধব সহ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং এই সমাজকে নিখুঁত পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এজন্য তারা স্ত্রী স্বাধীনতা সমর্থন করলেন এবং দাবী করলেন যে ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ—যারা উপাসনা করবেন, তাদের কোন উপবীত থাকবে না। এছাড়া তিনি অসবর্ণ বিবাহও প্রচলন করতে চাইলেন সমাজে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

বাংলার সমাজ জীবনে যখন চলছিল এই বিপ্লব, সংস্কারপন্থী, প্রাচীনপন্থীদের পারস্পরিক বিরোধের ফলে সমাজের বিকাশপথ যখন রুদ্ধ প্রায়, তখন দক্ষিনেশ্বরে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। সকল মতের সমন্বয় সাধন করে প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল এক অখণ্ড ভারতীয় মতবাদ। রামকৃষ্ণ দেবের মতে সকল ধর্মের সমন্বয়ই ভারতের ধর্ম। পথের বিচ্ছিন্নতা সত্বেও একই লক্ষ্যে পৌঁছা

সম্ভব যদি লক্ষ্য ভুল না করে কেউ। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর উপরই রামকৃষ্ণ দেবের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের Theistic Quartery Review পত্রিকায় আমরা একটি প্রবন্ধ দেখি, নব বিধান সমাজের প্রচারক রেভারেণ্ড প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের। এই প্রবন্ধে তিনি রামকৃষ্ণ দেব সম্বন্ধে লিখেছেন :—

তাঁর ও আমার মধ্যে সাদৃশ্য কি? আমি ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সভ্য, আত্মাভিমানী, অর্দ্ধ সন্দেহবাদী, তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী এবং তিনি দরিদ্র, বর্ণজ্ঞানহীন অমার্জিত রুচি, অর্ধ পৌত্তলিক, বন্ধুহীন হিন্দুভক্ত। কেন আমি তাঁর কথা শুনিবার জন্য বহুক্ষণ ধরে বসিয়া থাকি? কেন আমি তাঁহার কথা শুনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাই? এবং একা আমিই নই, আমার মতো বহু ব্যক্তিই এরূপ হয়ে থাকেন।"

বিবেকানন্দের প্রভাব

সাধারণের মধ্যেও রামকৃষ্ণ দেবের অসামান্য প্রভাব ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ দেব যা প্রচার করছিলেন, তা ছিল প্রধানতঃ ভক্তিবাদ, এই ভক্তিবাদকেই কর্মে রূপ দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশককে প্রধানতঃ বিবেকানন্দের যুগ বলা যেতে পারে। বাঙালীর পক্ষে এ যুগ ছিল সংগঠন যুগ। শিক্ষিত বাঙালী নূতনের জন্য সেদিন মরিয়া হয়ে উঠেছিল, সমাজকে তারা আবার নূতন করে গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু এজন্য তারা ছিল প্রধানতঃ পশ্চিমের মুখাপেক্ষী। আমরা দেখেছি, ব্রাহ্ম সমাজও বাঙালীকে এ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারেনি। বাঙালী জাতি তখনও আত্মনির্ভরতা শিখে পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়নি। দক্ষিনেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণই বাঙালীকে

প্রথমে এই পথের সন্ধান দেন। তাঁরই ভক্তিবাদকে কর্মের মধ্যে টেনে এনে বিবেকানন্দ গড়লেন এক নূতন বাঙ্গালী জাতি, নূতন ভারতের গোড়া পত্তন করলেন তিনি সেদিন। প্রাচ্যের ধর্মভাব ও প্রতীচ্যের সমাজ কল্যাণবোধ এরই সমন্বয়ে সৃষ্টি হল নরনারায়ণের সেবা এবং এই নরনারায়নের সেবাই হল বিপ্লবী বাংলায় ধর্ম। প্রকৃত পক্ষে, বিপ্লবী বাংলা সেদিন বিবেকানন্দকেই তাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল। বাংলায় বিপ্লবীদের বিভিন্ন দল ছিল কিন্তু এই আদর্শ সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন মত বিরোধ ছিলনা। চরম লক্ষ্য তাদের ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ইংরেজ বিতাড়ন কিন্তু প্রতিদিনকার কাজে তারা বিবেকানন্দের আদর্শ দ্বারাই ছিল অনুপ্রাণিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলার বিপ্লবীরাই ছিল বিবেকানন্দের আদর্শ রূপায়নে কর্মী। তাই আজও দেখি বিপ্লব যুগ শেষে পুরাতন কর্মিগণ অনেকেই রামকৃষ্ণ মিশনকে তাদের শেষ আশ্রয় রূপে গ্রহণ করেছেন।

ভগিনী নিবেদিতা

শুধু পরোক্ষ ভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবেও বিপ্লবীদল বিবেকানন্দের শিষ্যদের নিকট থেকে তাদের যাত্রাপথে সাহায্য পেয়েছে। এর মধ্যে সর্বাগ্রে ভগিনী নিবেদিতার নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রথম যুগের বিপ্লব সমিতি সংগঠনে ভগিনী নিবেদিতা কর্মীদের শুধু উৎসাহ দেন নাই, তিনি নিজেও সর্বদা এদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতেন। শিকাগোতে বিশ্বধর্ম যুদ্ধ বিজয়ী বিবেকানন্দ যখন লণ্ডনে আসেন, মিস মার্গরাটা নোবেল তাঁর ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং এদেশে চলে এসে ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে মিস

নোবল আইরিশ বিদ্রোহী দলের কর্মী ছিলেন। ভারতে এসেও তিনি যুবকদের মধ্যে এই মত প্রচার করতে থাকেন। সশস্ত্র বিপ্লব পথে ইংরেজদের ভারত হতে বিতাড়িত করবার কাজে তিনি যুবক সমাজকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করবার জন্য উৎসাহ দিতেন। ভারতের তিনি অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন, কিন্তু যুবকদের তিনি বিদ্রোহী করে তুলেছেন, এজন্য এদেশবাসী এক শ্রেণীর নিকট তিনি নিন্দা ভাজন হয়ে ছিলেন। ১৯১১ খৃঃ অব্দের ১৩ই অক্টোবর তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবার জন্য টাউন হলে যে সভা হয়, সভায় সভাপতি রূপে রাসবিহারী ঘোষ তাঁর বক্তৃতায়ও একথা উল্লেখ করে ছিলেন।

১৯০২ সালের গোড়ার দিকে ভগিনী নিবেদিতা যখন বরোদা যান, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাছে বাংলায় গুপ্ত সমিতি এবং বিপ্লবীদল অনুশীলন সমিতি গঠন বৃতান্ত শুনেন এবং প্রথমে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে এবং এর কিছু দিন পরে আবার বারীন্দ্রকে কলকাতায় পাঠান কলকাতার দলের সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য। যতীন্দ্রনাথ বাংলায় এসে পি, মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হলেন। অনুশীলন সমিতি নামে মাত্র এর পূর্বে গঠিত হয়েছিল। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন শ্রীসতীশ চন্দ্র বসু, জেনেরল এসেম্বলীর অধ্যাপক নলিনী মিত্র, বরিশালের সুরেন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার অশ্বিনী বন্দোপাধ্যায়, ভুবন চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র হালদার প্রভৃতি। তরুণ দলের নগেন্দ্র নাথ দত্ত, যতীন্দ্র নাথ রক্ষিত, ফনীন্দ্র নাথ ঘোষ, সত্য বিনয় ঘোষ, প্রভৃতি এই সমিতির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী সমিতি হিসাবে সমিতির কার্য্যারম্ভ যতীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এবং বারীন্দ্র কুমার এসে যোগ দেওয়ার পরেই আরম্ভ হয়।

অনুশীলন সমিতির গুপ্তকেন্দ্র

ঠাকুর বাড়ীতে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার সময়ে এর কোন স্বতন্ত্র ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। প্রথমদিকে জেনেরল এসেম্বলীর ব্যায়াগারই সমিতির ব্যায়ামশালারূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু যতীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এসে এর সঙ্গে যোগ দিবার পূর্ব্বে সমিতির ব্যায়ামশালা ছিল ২১ নং মদন মিত্র লেনে এবং অফিস ছিল নিকটেই একটি ছোট বাড়ীতে। যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বরোদা হ'তে এখানে আসার পরে, সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার কাছে ১০২ নং সার্কুলার রোডে সমিতির গুপ্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন—শ্রীঅরবিন্দ তখন গায়-কোবাড়ে তরুণ সয়াজী রাওএর রাজঅমাত্য, তিনি পুনার গুপ্ত বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত এবং গণতন্ত্রী ভারতের গুজরাট শাখার সভাপতি। কঠোর হস্তে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট চাপেকার সমিতিকে দলন করলেও সে আগুন একেবারে নিভে যায় নাই। অন্তঃ সলিলা হয়ে ছিল মাত্র। যখন বরোদার মহারাজার শরীর রক্ষার কাজে ইস্তফা দিয়ে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠন উদ্দেশ্যে সরলা দেবীর নামে অরবিন্দের পত্র নিয়ে বাংলায় আসেন, তখন দাক্ষিনাত্যের সে অগ্নি তুষাগ্নির মত অলক্ষে জ্বলছে। যতীনদা ব্যারিষ্টার পি মিত্র কে কেন্দ্র করে সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার কাছ ১০২ নং সার্কুলার রোডের বাড়ীতে গুপ্ত সমিতির প্রথম কেন্দ্রের পত্তন করলেন। অরবিন্দের কাছে আমি দীক্ষা নিয়ে এই কেন্দ্র আসি ১৯০৩ সালের গোড়ায়, যতীনদার বাংলায় আমার ৬ মাস পরে। এই হ'ল বাংলায় বিপ্লব বীজ বপনের প্রথম ও আদি সুত্রপাত।"

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরবিন্দ যতীন্দ্র নাথকে যখন বাংলায় পাঠান তিনি সরলা দেবীর নামে তার কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। সরলা দেবী পূর্ব হতেই এই দল-ভুক্ত এবং বিশেষ ভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সরলা দেবীই যতীন্দ্র নাথকে পি মিত্রের সঙ্গে পরিচিত করে দেন। সরলা দেবীর পিতা জানকী নাথ ঘোষাল কংগ্রেসের একজন কর্মকর্ত্তা ছিলেন। তিনি জাতীয় সম্পত্তির ব্যবস্থা ঠিকমত করছেন না এই অপবাদ থাকায় এজন্য কর্মীগণের মধ্যেও অনেকে সরলা দেবীকে অপচ্ছন্দ করতে থাকেন, এর ফলে বিপ্লবী দল হতে তিনি একটু দূরে সরে পড়েন। বাংলায় বিপ্লব যুগের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা যে এই যতীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় আজ হয়ত তা অনেকেই জানে না। ১৯৩০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর বরাহনগরে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর নাম ছিল তখন নিরালম্ব স্বামী। বর্ধমান জিলার চান্না গ্রামে যতীন্দ্র নাথ জন্ম গ্রহণ করেন। সে যুগে অন্যান্য বাঙ্গালী যুবকের ন্যায় যতীন্দ্রনাথও স্বাধীনতার আদের্শে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি বুঝেছিলেন এই আদর্শের সাফল্যের জন্য যুবক সমাজের অস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গালীর সৈন্যদলে প্রবেশাধিকার নাই।

স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত যতীন্দ্রনাথ সামরিক শিক্ষা লাভের অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। সৈন্যদলে বাঙালীর প্রবেশাধিকার নেই, কিন্তু অস্ত্র শিক্ষা ব্যতীত দেশোদ্ধারও সম্ভব নয়। তাই অবাঙ্গালী পরিচয়ে সৈন্যদলে প্রবেশ করবার জন্য কৃত-সংকল্প হলেন যতীন্দ্রনাথ। এজন্য হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি এলাহাবাদ গমন করেন এবং এখানে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং তাঁরই অধ্যক্ষতায় পরিচালিত

কায়স্থ পাঠশালায় (কলেজ) ভর্ত্তি হন। এলাহাবাদে অবস্থানকালে যতীন্দ্র নাথ রামানন্দ বাবুর পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রামানন্দ বাবুর পত্নীকে তিনি মাতৃসম্বোধন করতেন এবং রামানন্দ বাবুর পুত্রদের তিনি ছিলেন 'যতীনদা'। কিন্তু পরিবারিক স্নেহপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ তাঁর আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই। হিন্দী শিখবার জন্য তিনি এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়াতেন। হিন্দীর সহজ সরল বচন ভঙ্গীর সঙ্গে সুপরিচিত হওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এলহাবাদের নিকট আড়াই গ্রামে কনোজিয়া ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় পরিবারদের বাস। এই পরিবারের যতীন্দর উপাধ্যায়—এই নামে যতীন্দ্রনাথ বরোদায় গিয়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে এই পরিবারেই অন্য এক ব্যক্তি মহারাজের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হতে গেলে, যতীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং যতীন্দ্রনাথকে বাধ্য হয়ে কর্মে ইস্তফা দিতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে বরোদায় ছিলেন। এই ঘটনার সূত্রেই তাঁর সঙ্গে যতীন্দ্র নাথের পরিচয়।

১৯০৮ সালে মে মাসে ৩২ নং মুরারী পুকুর রোডে বোমার কারখানা ও অস্ত্র শস্ত্র ধরা পড়ল। এটা ছিল অরবিন্দ বারীন্দ্রদের বাগানবাড়ী। এর ফলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মানিকতলা বোমার মামলার সৃষ্টি হল। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন বন্দোপাধ্যায়, হেম কানুনগো, উল্লাস কর দত্ত প্রভৃতি গ্রেপ্তার হলেন। এর কিছুদিন পরে যতীন্দ্রনাথও স্বগ্রামে গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু প্রাথমিক তদন্ত সময়েই ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি তাঁকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দেন। কিন্তু এর পূর্বেই তিনি বিপ্লব সমিতির সঙ্গে সংস্পর্ক ত্যাগ করে সোহং স্বামীর নিকট দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় থেকেই তিনি নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন। এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার তাঁর আত্ম কাহিনীতে লিখেছেন—

"নিরালম্ব স্বামী যখন যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, তখন তিনি আমাদের বিপ্লবের প্রথম কর্মী নেতা, সে একবারে গোড়ার কথা।" কিন্তু যতীন্দ্র নাথ ও বারীন্দ্র বেশী দিন একসঙ্গে কাজ করতে পারেননি। অল্প দিনের মধ্যেই বিরোধ আরম্ভ হল।

বাংলায় প্রকাশ্য ও গোপন আন্দোলনের কর্মীদের ও নেতাদের মধ্যে বিরোধ বহুবার এই ধারার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে, কর্মীদের ক্ষমতা প্রাধান্য লাভ চেষ্টা দ্বারা বহুবারই স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার কর্মপ্রচেষ্টা কলুষিত হয়েছে এখানেই বোধ হয় তার আরম্ভ। যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বারীন্দ্র প্রভৃতি অভিযোগ করলেন যে তিনি অশ্বক্রয়ে অত্যধিক অর্থব্যয় করেছেন এবং তার পরিচালনাও ব্যয়বহুল। অভিযোগের মুলে কোন সত্য ছিলনা। এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে সত্যাসত্য নির্ণয়েব ভার পড়ে ছিল বৃদ্ধ যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের উপর। তিনি অনুসন্ধান করে এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন। প্রকৃত পক্ষে এ ছিল ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতা।

অভিযোগের পরেই যতীন্দ্রনাথ দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের ফলে অভিযোগমুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় দলে ফিরে আসেন, কিন্তু কিছুদিন এক সঙ্গে কাজ করবার পরেই আবার বিরোধ উপস্থিত হল। এবারে দল ছেড়ে দিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হলেন, বোমার মামলার তিনি যখন ধরা পড়েন তার বয়স ছিল প্রায় ৩০ বৎসর।

বিপ্লবযুগের নূতন অধ্যায়

যাহোক, প্রমথনাথ, বারীন্দ্র এবং যতীন্দ্র নাথের উদ্যোগে বাংলার বিপ্লবযুগের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল। এই সময়ে অনুশীলন

সমিতির ব্যায়ামশালায় লাঠি খেলা, অসি খেলা, ছোরা খেলা, কুস্তি, মুষ্টি যুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। শরীর সাধনের সঙ্গে সদস্যদের চরিত্র গঠনের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হত। যুবক সমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তাদের সাহসী ও বীর্য্যবান করে তুলে মুক্তিযুদ্ধের উপযোগী সৈনিক করে তুলবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা এখানে ছিল। সমিতির সদস্যগণের জ্ঞান চর্চার জন্য সমিতির নিজস্ব পাঠাগার ছিল। পাঠাগারে সংগৃহীত গ্রন্থমালার মধ্যে ছিল—দেশ-বিদেশের বীরপুরুষ, দেশভক্ত, সাধু পুরুষ এবং বিখ্যাত মনীষী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবনী, দেশ বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক রচনাবলী, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি। সমিতির সদস্যদের নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ছিল। রবিবার দিন নির্দিষ্ট সময়ে এজন্য সমিতিগৃহে সদস্যদের উপস্থিত থাকতে হত।

সমিতির উদ্যোক্তাদের সংকল্প ছিল প্রথমে বাংলাদেশের বিভিন্ন সহরে ও পল্লীতে পল্লীতে সমিতির শাখাস্থাপন করে এর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে একে বিস্তারিত করে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সমিতির কর্মধারা ছিল দ্বিমুখী—প্রথম, উপরোক্ত প্রকাশ্য উপায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক গড়ে তোলা, দ্বিতীয়, এর মধ্য হতে কর্মী বেছে নিয়ে গুপ্ত সমিতির মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা।

আত্মোন্নতি সমিতি

ঠাকুর বাড়ীতে যখন সঞ্জীবনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই শিবনাথ শাস্ত্রী যুবকদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন এ আমরা

দেখেছি। সঞ্জীবনী সভা যখন সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্য নিয়ে অনুশীলন সমিতিতে পরিণত হল, শিবনাথের দল ও পিছিয়ে পড়ল না। এদের সমিতির নাম হল আত্মোন্নতি সমিতি। নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকটি ছাত্র এই সমিতি স্থাপন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী পিছন থেকে সবসময়ে এদের প্রেরণা যোগ্যতেন। নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন। এই সময়ে যারা দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, চন্দননগরের প্রভাস দেব, হরিশচন্দ্র সিকদার, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে সাধারণ নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে এদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লব সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু প্রভাস দেবের নেতৃত্বে সংঘের বিপ্লবী কর্ম প্রচেষ্টা সমান ভাবেই চলছিল। দলের প্রধান সদস্য আজীবন বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলী সম্প্রতি দেহত্যাগ করেছেন। পরবর্তীকালে ইন্দ্রনাথ নন্দী, নরেন্দ্র ব্যানার্জী নরেন্দ্র নাথ বসু, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অংশু বন্দোপাধ্যায়, প্রভৃতি বিশিষ্ট বিপ্লবী এই দলে যোগদান করেন। ১৯২৪ সালে শাঁখারী টোলা পোষ্ট মাষ্টার হত্যা মামলায় আসামী বরেন ঘোষ এবং পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষেপকারী গোপীনাথ সাহা এই দলের সদস্য। ১৯৩১ সালে হিজলী বন্দী শালায় সিপাহীর গুলিতে নিহত সন্তোষ মিত্র এই দলের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। প্রধানতঃ মধ্য কলকাতাই এই দলের কর্মক্ষেত্র ছিল। ক্রমে হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রের শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের আত্মোন্নতি সমিতি নাম বেশী দিন চলেনি। প্রভাস দেবের মৃত্যুর পরে বিপিন গাঙ্গুলী দলের সর্বময় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং দলটি বিপিন গাঙ্গুলীর দল বা বিপিনদার দল

নামেই পরিচিত হয়। এই দলের কর্মক্ষেত্র বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনুশীলন সমিতির ন্যায় এ দল কখনও সর্বভারতীয় বা সমগ্র বাংলার দল হয়ে ওঠেনি। তবে যতীন্দ্রনাথ এবং বারীন্দ্রের বাংলায় পদার্পণ করবার অনেক আগেই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং নানা বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে চলে বাংলার বিপ্লব সমিতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিপ্লব যুগের শেষদিন পর্য্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

আমরা দেখেছি পি মিত্র যখন অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর একাজে সরলা দেবী চৌধুরাণী সহায় ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি দলের সদস্যদের অপ্রিয় হবার ফলে দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর পরে শ্রীরামপুরের বড় লাঠি খেলোয়াড় প্রফেসর মার্ত্তাজাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এক স্বতন্ত্রদল গঠন করেন। এরপরে তিনি প্রধানতঃ যুবসমাজের শরীর চর্চায় উদ্যোগী করার কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। এজন্য তিনি বীরাষ্টমী ব্রত প্রবর্ত্তন করেন। দুর্গা পূজায় অষ্টমী দিনে এই ব্রত উদ্‌যাপিত হত। এই উপলক্ষে যুবক দল লাঠি খেলা, অসি খেলা প্রভৃতি প্রদর্শন করত এবং প্রতিযোগিতায় যারা দক্ষতা দেখাত তাদের পুরস্কৃত করা হত। সরলা দেবী প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী সমিতি ত্যাগ করলেও তাঁর এই সমস্ত কার্য্যের ফলে বিপ্লবীমত প্রচারে কম সাফল্য হয়নি। ি ন্তু অনুশীলন সমিতি ত্যাগ করলেও মার্ত্তাজা এসে সমিতির ব্যায়ামশালায় লাঠি ও অসি খেলা শিখিয়ে যেতেন। এছাড়া তারও বহু ক্লাবে মার্ত্তাজা ছোট লাঠি খেলার শিক্ষকতা করতেন। মার্ত্তাজা তুরস্কদেশের অধিবাসী ছিলেন। এখানে তিনি বাস করতেন শ্রীরামপুরে। ছোট লাঠি ও অসি খেলায় তিনি এতো ওস্তাদ ছিলেন যে ছাত্র ও যুবক সমাজে তিনি প্রফেসর মার্ত্তাজা নামেই পরিচিত ছিলেন। অনুশীলন সমিতিতে বড় লাঠি খেলারও ব্যবস্থা ছিল। খেলা শিখাতেন উলুবেড়িয়ার অতুল ঘোষ।

বঙ্গ বিভাগের কিছু পূর্ব্বে ১৯০৪ খৃঃ অব্দে পাঞ্জাব হতে টহল রাম গঙ্গারাম নামে একজন আর্য্যসমাজী প্রচারক কলকাতায় এলেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তিনি পার্কে পার্কে বক্তৃতা করতেন। সভার পরে যুবকদের এক শোভাযাত্রা রাস্তা পরিক্রমণ করত। শোভাযাত্রায় গান ছিল—"God Save our glorious Ind."

অনেকের ধারণা 'বয়কট' বা বৃটিশ বর্জন বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের সৃষ্টি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই টহলরামই যে যুবক সমাজকে বৃটিশ বর্জনের জন্য উত্তেজিত করছিলেন সরকারী রিপোর্টেই তা স্বীকার করা হয়েছে। সরলা দেবীর কর্মীবৃন্দ টহলরামের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই আন্দোলনকে আরও সতেজ করে তোলেন। অনুশীলন সমিতি ও আত্মোন্নতি সমিতি এদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য দল বৃদ্ধি করছিল। এই সময়ে অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে যে কর্মীদল স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করছিল সমিতি তাদের মধ্য থেকেও সদস্য সংগ্রহ করেছিল।

রামায়ণ কথকতা

অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে রামায়ণ নামে এক কথকতা গোপনে অনুষ্ঠিত হত। এই উপলক্ষে যে গান গাওয়া হত তার কিছুটা নমুনা দিয়েছেন শ্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় তার বিপ্লবী যুগের কথাতে।

সিংহের দাপটে প্রাণ যায় ওমা
আনলে কোথা হতে বিকট পশু দেখে যে ভয় পাই ওমা
পশুর রাজা সিংহ বটে তাই চরণ দিয়ে দিলি পিঠে
সে যে মহাশক্তির চরণ পেয়ে তাইতে ল্যাজ ফোলায় ওমা।

দেমা অস্ত্র দয়া করে বেটাকে তাড়াই দূরে
ও তোর অশান্ত বলে আর নাহি ভয় মা
শক্তি পূজা করতে দেখে ব্যাটা কটমটিয়ে থাকে
সে তো নাহি মনে ভাবে আমরা তোর তনয় মা।

বৃটিশ সিংহকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য দেবীর নিকট অস্ত্র প্রার্থনা করা হচ্ছে। সুতরাং সমিতির উদ্দেশ্য যে গোড়া থেকেই সশস্ত্র বিপ্লব ছিল এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। সমিতির সদস্যগণ দেশ প্রেমের আদর্শকে সকলের উপরে স্থান দিতেন। অন্য একটি সঙ্গীত থেকে তা আমরা বুঝতে পারি।

স্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে
অতি মহাপাপী হোক না কেন
তবুও সেইজন অতি মহাজন
সার্থক জনম তাহারি জেন।
দেশহিত ব্রত পরশমাণ পরশিবে যারে যখন
রাজভয় আর কারাভয় ঘুচিবে তাদের তখনি জেন
মাতৃভূমিতরে যেই অকাতরে
নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে
অপঘাত ভয় থাও তার গোলক যায় সেইজন।

জেলা জজ শ্রীবরদা চরণ মিত্র এই সময়ে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা গানটি রচনা করেন। বিপ্লবী তরুণদের নিকট অল্প দিন মধ্যেই সঙ্গীতটি প্রিয় হয়ে উঠে—এ যেন তাদের মনের কথা, সঙ্গীতটি যেন তাদের সংকল্প।

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা
অভয়া চরণে নম্রশির।

ডরিনা রক্ত ঝরিতে ঝরাতে
দৃপ্ত মোরা ভক্ত বীর।
আবাহন মার যুদ্ধ কারণে
দৃপ্ত তপ্ত রক্ত ক্ষরণে
পশুবল আর অসুর নিধনে
মায়ের খড়্গ ব্যগ্র ধীর।
মায়ের আরতি অরাতি নাশন
পদে অঞ্জলি বাঞ্ছা পূরণ
শত্রু রক্তে মায়ের তর্পণ
জবার বদলে ছিন্ন শির।

বিদেশী ঘটনার প্রভাব

বিদেশের কতকগুলি ঘটনাও এই সময়ে বিপ্লব মতবাদ প্রচারে সাহায্য করেছিল। তার মধ্যে বুয়র যুদ্ধ এবং জাপানের নিকট রুশিয়ার পরাজয় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সম্পর্কে এডমিনষ্ট্রেশন কমিটির রিপোর্টে আছে:—"ইলবার্টবিল আন্দোলনের সময়ে বাংলা দেশে ইংরেজ বিদ্বেষ মূলক তিক্তভাব সূত্রপাত হয়। কিন্তু তা সত্বেও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের কোন প্রকার গুরুতর বৈপ্লবিক মনোভাব ছিলনা। বুয়র যুদ্ধ এবং রুশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের জয়লাভ হতেই এইরূপ মনোভাব দেখা দিয়েছে।"

বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন

১৯০৫ সালে ৭ আগষ্ট লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হল। বাংলার জাতীয় জীবনে এ আন্দোলনকে নবজাগরণ বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের এই সময়কে কবি তাঁর সঙ্গীতে রূপ দিয়েছেন—

তোর মরা গাছে বান ডেকেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী।

বাঙ্গালী আপনার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ না ভেবেই এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ভাবোন্মাদনার এক প্রবল বন্যাপ্রবাহ সমগ্র বাংলা দেশকে প্লাবিত করেছিল। এই আন্দোলনের ফলেই বাঙালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনে এক অপূর্ব বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হল। এই সুযোগে বিপ্লববাদীদল তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে নিল।

১৮৯৯ খৃঃ অব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে কলকাতা এলেন। জাতীয় কংগ্রেস তাকে অভিনন্দন জানাল এবং এই আশা ব্যক্ত করল যে তাঁর শাসনকালে আবার উদারনীতি অনুসৃত হবে। কিন্তু তাদের এই আশা কতটা সফল হবে তা বুঝতে বিলম্ব হল না। ভারত সভার পক্ষ হতে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লাটপ্রাসাদে গেলেন কিন্তু দেশী পাদুকা প'রে ছিলেন বলে কেউই সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন না। কংগ্রেসের প্রতি তার বিরূপ ভাবও অল্প দিনের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ল। ১৯০০খৃঃ অব্দে ১৮ নবেম্বর তিনি ভারত সচিবকে লিখলেন, "আমার বিশ্বাস এই যে, অল্প দিনের মধ্যেই কংগ্রেসের পতন হবে। আমার প্রধান প্রচেষ্টা এই হবে যে আমার ভারতে অবস্থান

কালের মধ্যেই একে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিতে হবে।" এই নীতি নিয়েই তিনি ৭ বছর ভারত শাসন করে গেছেন এবং এর আশু ফল ভারতের পক্ষে দুর্গতির কারণ হলেও সুদূরপ্রসারী ফল ভারতের পক্ষে শুভই হয়েছে। কার্জনশাসন ভারতবাসীকে শুধু আত্মনির্ভরতা শিখায়নি, কার্জনের অপমানে ক্ষুব্ধ ভারতবাসী, বিশেষভাবে বাঙ্গালী জাতি আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে লিখেছেন, "আমরা প্রশ্রয় চাহিনা—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতায় রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব, সমাদর নয়, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।"

লর্ড কার্জন বাঙ্গালী জাতিকে সর্বাপেক্ষা বড় আঘাত করেছেন বঙ্গ দেশেকে দ্বিখণ্ড করে। এদেশে এসে তিনি দেখলেন বাঙ্গালীর নেতৃত্বে ইংরেজবিদ্বেষ ক্রমেই অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠছে। তাই এর প্রতিকার করতে চাইলেন বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ড করে। পূর্ব্ববঙ্গকে মুসলিম প্রধান অঞ্চল করে তিনি সেখানে বৃটিশ অনুরাগ অক্ষুন্ন রাখতে চাইলেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্য এ জল্পনা কল্পনার বস্তুমাত্র ছিল। ১৯০৩ সাল ও ১৯০৪ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বটে কিন্তু বঙ্গবিভাগ যে হবেই এ সম্পর্কে কেহই তখনও সন্দেহাতীত হতে পারেন নি। কিন্তু ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই হঠাৎ শুনাগেল, বঙ্গব্যবচ্ছেদে ভারত সচিব সম্মতি দিয়েছেন। এই বিভাগের ফলে রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হবে এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ, বর্দ্ধমান বিভাগ ও বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর প্রদেশ নিয়ে নূতন বঙ্গদেশ গঠিত হবে। কার্জনের এই কশাঘাত বাঙালীজাতকে সচেতন করে তুলল, তাদের মোহ নিদ্রা

ভেঙ্গে গেল যেন। বঙ্গ ভঙ্গ প্রতিরোধ করতেই হবে—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাঙ্গালী আন্দোলনে নামল—ইতিহাসে এ আন্দোলনের তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতন ভাবে অনুভব করিব যে বাঙ্গালার পূর্ব্ব পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহু পাশে বাঁধিয়াছেন একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্ত স্রোত সমস্ত বঙ্গ দেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়াছে। জননীর বাম দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙ্গালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে।" এ কবির কল্পনা নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির এই সময়ের মনের কথা।

শুধু বঙ্গ বিভাগেই নয়, আরও কয়েকটি বিষয়ে কার্জন এদেশবাসীর মন বিক্ষুব্ধ করে তুললেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইন করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করলেন, শাসন কার্য্য পরিচালনায় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় নিয়োগ করবেন স্থির করলেন। এ সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্য ভাবে বললেন, ভারতবাসীরা উচ্চ দায়িত্বশীল পদের অযোগ্য। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রস্তাব আনলেন সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। তিনি হিসাব করে দেখালেন, যে সব পদের বেতন হাজার টাকা বা তার উপর তার মধ্যে মাত্র শতকরা ১৪ জন ভারতীয় এবং পাঁচশ টাকা বেতনের পদগুলিতে ভারতীয়ের সংখ্যা শতকরা ১৭ জন মাত্র।

সাত বৎসর ধরে শাসনকার্য্য পরিচালনার পরে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মতদ্বৈধতা উপস্থিত হওয়ায় লর্ড কার্জন কমে

ইস্তফা দিয়ে বিলাত চলে যান। ১৯০৫ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে চ্যান্সেলরের বক্তৃতায় লর্ড কার্জন সমগ্র এসিয়া বাসীদের মিথ্যাবাদী, অসভ্য কপটতাপ্রিয় বলে গালি দেন। কার্জনের এই দাম্ভিক উক্তির প্রতিবাদে সমগ বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ভগিনী নিবেদিতা পর্যান্ত অমৃতবাজার পত্রিকায় এর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। কার্জনের লেখা উদ্ধৃত করে তিনি কাগজে দেখিয়ে দেন যে কার্জন নিজেই মিথ্যাবাদী। ৩০ শে মার্চ টাউন হলে প্রতিবাদ সভা হল ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে। কার্জনের আঘাতের ফলে বাঙ্গালী যে শুধু আহত হ'ল তাই নয়, বাঙালা এতে অপমানিত বোধ করলে। তাই বাঙ্গালীর মধ্যে জাগল প্রতিশোধের স্পৃহা, যুবক সমাজের মধ্যে সুরু হল প্রতিশোধ গ্রহণের আয়োজন। অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি প্রভৃতি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্য সংগ্রহের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন সঙ্গীতে ও বক্তৃতায় সমগ্র বাংলাদেশ-ব্যাপী এক অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করল। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, রজনী কান্ত সেন, কালাপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির সঙ্গীত, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির প্রবন্ধ, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুরেশ চন্দ্র সমাজপতির বক্তৃতা সমগ্র বাঙালী জাতিকে মাতিয়ে তুলল। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাঙ্গালী যুবকদল উতলা হয়ে উঠল।

২০ জুলাই বঙ্গবিচ্ছেদ ঘোষনার পরে ৭ আগষ্ট প্রতিবাদ সভা হল টাউন হলে। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ১৬ অক্টোবর ৩০ আশ্বিন বঙ্গবিভাগ কার্য্যে পরিণত হবার কথা। রবীন্দ্রনাথ উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ রাখীবন্ধন প্রস্তাব করলেন। রাখীবন্ধনের মিলন মন্ত্র

রবীন্দ্রনাথের রাখীসঙ্গীত এই দিনে গীত হল, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে বাংলার আকাশ বাতাস ধ্বনিত করে সঙ্গীত উঠল—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুন্য হউক পুন্য হউক
পুন্য হউক হে ভগবান।

আরও একটি সঙ্গীত এই দিনেই গীত হয়। গানটি বহুদিন পর্য্যন্ত বিপ্লবী সমাজের প্রিয় সঙ্গীত ছিল—

ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের আঁখি যত রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে—
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই
স্বপ্ন দেখার সময় যে নাই
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই,
তন্দ্রা ততই ছুটবে—
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।

অত্যাচার লাঞ্ছনার মধ্যে, সরকারের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় দিনে বিপ্লবীরা কখনও গান গেয়ে কখনও বা কবিতারূপে আবৃত্তি করে এথেকে শক্তি সংগ্রহ করেছে, শত অত্যাচার সত্বেও নিজেকে ভেঙে পড়তে দেয় নি।

স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লববাদ

স্বদেশী আন্দোলনের ফল বাঙালী জীবনে দুইটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দেখতে পাই—প্রথমতঃ, ব্যবসা ও শিল্প ক্ষেত্রে বঙ্গে এক নবযুগের সূচনা, দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবী শক্তিরূপে বাংলার আত্মপ্রকাশ। প্রথমোক্তটির নিদর্শন—বঙ্গলক্ষী কাপড়ের কল, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল হোজ ফ্যাক্টারী, ষ্টীল ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টারী, ট্যানারী ফাক্টারী, হিন্দুস্থান ও ন্যাশনাল বীমা কোম্পানী প্রভৃতি। দ্বিতীয়টির নিদর্শন—১৯১৬ হইতে ১৯৩৬ এই ত্রিশ বৎসরব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলন।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলায় বিপ্লবসমিতিসমূহ শক্তিশালী হয়ে উঠল, এর পরিধিও প্রসারিত হতে লাগল। কিন্তু এ সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা অনুশীলন সমিতির ঢাকা শাখা প্রতিষ্ঠা। বাংলায় বিপ্লববাদের ইতিহাস উত্তরকালে এই সমিতি এক বিশিষ্ট অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। পি মিত্রের সঙ্গে বারীন্দ্রের বিরোধের পরে কলিকাতা সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। বারীন্দ্রের দল যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলে ক্রমশঃ এদল যুগান্তর দল বলেই পরিচিত হয়ে পড়ে এবং এই দলের নেতৃত্বাধীনেই পশ্চিমবঙ্গ বিপ্লবীদের দলের সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হতে থাকল। কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে ঢাকা অনুশীলন সমিতি বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কালক্রমে অবস্থা এরূপ দাঁড়াল যে মূল অনুশীলন সমিতির কথা সবাই ভুলে গেল এবং ঢাকা অনুশীলন সমিতিই অনুশীলন সমিতি বলে পরিচিত হল।

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট, টাউন হলে মিটিং এর সঙ্গে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হল। টাউন হলে এই মিটিং এর একটা ইতিহাস আছে। বঙ্গ বিভাগের পূর্বেই ইংরেজ বিদ্বেষ কিভাবে দেশময়

ছড়িয়ে পড়েছিল এ তারই প্রমাণ। এক সময় ছিল যখন যা কিছু ইংরেজী, যা কিছু বিদেশী স্থায়ান্যায় নির্বিশেষে তারই উপাসক হয়ে পড়েছিল যুবকদল। আর ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগপূর্ব এবং বঙ্গ বিভাগের এই যুগে আমরা দেখি যা কিছু বিদেশী যুবকসমাজ তাই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবার জন্য কৃতসংকল্প। ৭ই আগষ্টের এই সভায় দেশের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। এখানে শোকচিহ্ন স্বরূপ হলটি কাল কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল হল এণ্ড এণ্ডারসনকে দিয়ে। কিন্তু যুবকদল একত্রিত হয়ে এই কাল নিদর্শন ছিন্ন ভিন্ন করে এতে আগুন লাগিয়ে একেবারে ভস্মসাৎ করে ফেলল। এর কারণ কালো কাপড় বিলিতি শোকের অনুকরণ। তাই বিলাত বর্জনের সঙ্গে তারা সাগর পারের এ শোকচিহ্নও বর্জন করল। আর এই সভায়ই প্রথম বয়কটের মন্ত্র শোনালেন শ্রীকৃষ্ণ কুমার মিত্র।

বঙ্গ বিভাগ ঘোষণার পরে তিনমাস ধরে জোর আন্দোলন চলল। কিন্তু এ সত্ত্বেও বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হল ১৬ অক্টোবর। রাখী বন্ধন ও অরন্ধনের ভিতর দিয়ে বাঙালী পালন করলে প্রতিবাদ দিবস। দ্বিগুণ ক্ষোভে বাঙ্গালী ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামে।

ভাবোন্মাদনার সে বন্যাপ্রবাহ সমগ্র বাংলা দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। বিপ্লবীপন্থী নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করবার এ সুযোগ ছাড়লেন না। দেশের সর্বত্র বিপ্লব সমিতির সংখ্যা বাড়তে লাগল। বিভিন্ন সহরে এবং পল্লীতে পল্লীতে সমিতি গড়ে উঠতে লাগল।

ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা

১৬ অক্টোবর বঙ্গ বিভাগ কার্য্যে পরিণত হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে পি মিত্র ও বিপিন পাল ঢাকায় গেলেন সেখানে অনুশীলন সমিতির

শাখা প্রতিষ্ঠা করবেন বলে। সমিতি প্রতিষ্ঠার পরে এর পরিচালন ভার অর্পিত হল বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও সুদক্ষ লাঠিশিক্ষক স্বর্গত পুলিন বিহারী দাসের উপর। এ সম্পর্ক পুলিন বিহারী লিখেছেন :—

মিডফোর্ড হাসপাতালের সম্মুখে একটি তেতলা বাড়ীতে পি মিত্র ও বিপিন পালের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, ঠিক নিম্নতলে একটি পুলিশ ব্যারাক ছিল। সন্ধ্যার পরে পি মিত্র ও বিপিন পাল স্বদেশী সঙ্গীত ও বন্দেমাতরম ধ্বনির সহিত বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইল, কতিপয় উকিল, যুবক ও ছাত্র ও উপস্থিত ছিল, আলোচনার মধ্যে হঠাৎ পি মিত্র বলিয়া ফেলিলেন—"এ সমস্ত স্বদেশী ফদেশী, বিলাতী বর্জনে কিছুই হবেনা; ক্ষমতা থাকে তো ইংরেজ তাড়াও নয়তো নহে।" কয়েকজন উকিল প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—এ যে অসম্ভব, একি হইতে পারে? পি মিত্র উত্তেজিত হইয়া দাড়াইয়া উঠিয়া দম্ভের সহিত বলিলেন—আমরা আর ফিরতে পারিনা The sword has been drawn, it must be thrust either in the breast of our enemies or in our own wherever.

—বলিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনবার সবেগে আপন বক্ষে করাঘাত করিলেন। অনেকেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিল, "আমরা ভাই এসবের ভিতরে নাই" বলিতে বলিতে একসঙ্গে বাহির হইয়া গেল, কেহ কেহ বা ফিস ফিস করিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু কতিপয় ছাত্র ও যুবক পি মিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এই সকল ছাত্র ও যুবকের দল পি মিত্রের সঙ্গে গোপন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। আলোচনা পরদিন রাত্রে এবং তার পরের দিন প্রভাতেও চললো। বর্ত্তমানে আমেরিকা প্রবাসী তারকনাথ পি এইচ ডি এই সভায় ছিলেন।

স্থির হইল ঢাকাতে একটি বিপ্লবীদল সৃষ্টি হইবে, সমস্ত যুবক .এক নেতার অধীনে উঠিবে বসিবে এবং তাহার আদেশ বিনা বাক্যে প্রতিপালন করিবে।

পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে পরেরদিন সকালে বিপিন পাল ও পি মিত্রের সম্মুখে বহু ছাত্র ও যুবক সমবেত হইল, কতিপয় উকিলও যোগদান করিল, আনন্দ চক্রবর্ত্তি উকিল মহাশয়কেও ডাকিয়া আনা হইল। বিভিন্ন আলোচনা ও প্রস্তাবনার পব স্থির হইল—"এক নেতার অধীনে বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার সব্ব রূপ আদেশ প্রতিপালন করিবে"—এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া ছাত্র ও যুবকগণের একটি সমিতি গঠন করিতে হইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছে জানাইয়া প্রায় ৭১ জন ছাত্র ও যুবক নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিল। ছাত্র ও যুবকগণের প্রস্তাব মতে আনন্দ চক্রবর্ত্তি এই সমিতির অধিনায়ক হইলেন। ... ... বিপিন পাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আনন্দ চক্রবর্ত্তী যদি কোন অন্যায় আদেশ দেন তাহাও পালন করিবেত? ছাত্র ও যুবকদল সমস্বরে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, করিব। পি মিত্র ব্যাখা করিয়া বলিলেন,—এস্থলে অন্যায়, অর্থে বুঝিতে হইবে আপাত দৃষ্টিতে অন্যায়, কিন্তু পরিণামে শুভফল দায়ী, তোমাদের মানিয়া লইতে হইবে, যাঁহাকে তোমাদের অধিনায়ক করলে তিনি কথনও তোমাদের বা তোমাদের দেশের অনিষ্ট কামনা করতে পারেন না। আনন্দ চক্রবর্ত্তীও সামান্য বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়া ছাত্র ও যুবক .গণের তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া ছিলেন। তৎপরে প্রশ্ন উঠিল সমিতির পরিচালক কে হইবে? দুইটি সুস্থকায় বলিষ্ঠ যুবক যোগেন্দ্রনাথ ও নিশি চৌধুরী) আমার নাম প্রস্তাব করিল। (এতক্ষণ আমি দর্শক মাত্রই ছিলাম আলোচনাতে যোগেদেই নাই—আনন্দ চক্রবর্ত্তিকেও চিনিতাম না। কিন্তু আমার দীনবেশ ও ক্ষীণদেহ দেখিয়া অধিকন্তু

আমি একজন নির্জীব জড়বৎ বসিয়াছি দেখিয়া পি মিত্র উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, না না এর মত লোক আমি চাই না, আমি চাই তোমাদের ন্যায় (নিশি ও যোগেন্দ্র) যুবক, যে একটি মাত্র কথা দ্বারা অপর সকলকে বশে রাখিতে পারিবে। কিন্তু নিশি ও যোগেন্দ্র বলিল, ইনি ভিন্ন আর কেহই তাহা পারিবেনা। পি মিত্র তখন অন্যান্য যুবকদের জিজ্ঞাসা করিয়া ও একই উত্তর পাইলেন, তৎপরেও পি মিত্র নিশি ও যোগেন্দ্রকে বলিলেন, তোমাদের দুই জনের মধ্যে একজন পরিচালক হও! কিন্তু তাহারা বারবারই আমার নাম বলিতে লাগিল! তখন পি মিত্র অনিচ্ছা সত্বেও আমায় পরিচালক করিতে স্বীকৃত হইলেন। (নিশি চৌধুরী বর্ত্তমান হাজারিবাগে একজন বড ডাক্তার! যোগেন্দ্র নাথ আমেরিকা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হইয়াছিল বর্ত্তমানে পরলোকে ।)

তৎপর প্রশ্ন উঠিল, সমিতির নাম কি হইবে, কেহ বলিল—শক্তি সমিতি, কেহ বলিল, বান্ধব সমিতি, কেহ বলিল,—বন্দেমাতরম সমিতি, ইত্যাদি। পি মিত্র বলিলেন, আমি কলিকাতার সমিতির নাম দিয়াছি অনুশীলন সমিতি, তোমরা সেই নামই দাও,—তবেই বঙ্গদেশময় এক নামে একটি বিরাট শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইবে। বঙ্কিম বাবুর অনুশীলন প্রবন্ধ হইতেই আমি এই নামটি গ্রহণ করিয়াছি। অনুশীলন শব্দের অর্থ চর্চ্চা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা, আমরাও চর্চ্চা এবং পরীক্ষা দ্বারা যেখানে যাহা ভাল পাইব তাহাই গ্রহণ করিব। তাই এই সমিতির নাম অনুশীলন সমিতি হইল। পি মিত্র সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন।"

এর কিছুদিন পরে নবেম্বর মাসে পুলিনবাবু পি মিত্রের আদেশে কলকাতায় এলেন, বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির নিয়মানুযায়ী যথারীতি দীক্ষা নিতে। অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় তখন ৪৯নং কর্ণওয়ালিশ

ষ্ট্রীটে। ব্যায়ামশালাও এখানেই অবস্থিত ছিল। এই বছরের প্রথম ভাগেই কার্য্যালয় ও ব্যায়ামশালা এখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। পুলিনবাবু কলিকাতাসমিতির পরিচালক শ্রীসতীশ বসুর অতিথি হন। পি মিত্র থাকতেন, বর্তমান মুকবধির বিদ্যালয়ের নিকট ১২১ নং সার্কুলার রোডে। দীক্ষার বিবরণ দিয়েছেন পুলিনবাবু নিজে—

"পি মিত্রের আদেশমত এক বেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পি মিত্রের বাড়ীতে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলাম। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প চন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিয়া পি মিত্র যজ্ঞ করিলেন। পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম, আমার মস্তকে গীতা স্থাপিত হইল, তদুপরি অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডায়মান রহিলেন, —উভয় হস্তে ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নিকে ও পি মিত্রকে নমস্কার করিলাম।"

দীক্ষার পর পুলিনবাবু কিছুদিন কলকাতায় থেকে লাঠি খেলা প্রভৃতি শিখলেন। পি মিত্র এর পর তাঁকে অনুশীলন সমিতির Executive Commander নিযুক্ত করলেন এবং ঢাকা ফিরিবার সময়ে আনন্দ চক্রবর্ত্তীর নিকট চিঠি লিখে একথা জানিয়ে দিলেন। ঢাকায় ফিরে গিয়ে পুলিন বাবু নবীন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করলেন এবং তিন বছরের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ ও আসামের বহু সহরে ও পল্লী অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হল। পুলিন বাবুর সংগঠন প্রতিভা গুণে ঢাকা সমিতি এক শক্তিশালী বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।

শিবাজী উৎসব

মারাঠা কেশরী বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে এবং চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচালনায় ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে প্রথম শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় একথা পূর্বেই বলেছি। এরপর প্রতি বৎসরও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। বঙ্গবিভাগের পরে বাংলাদেশে এই উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী হলেন নব্য সংঘ। রাজনৈতিক আন্দোলনকে আর প্রদেশ বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্বভারতীয় করে তুলবার ইচ্ছা এর পশ্চাতে ছিল। উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব এবং প্রধান হোতা হলেন বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্ত। এই উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে বাল গঙ্গাধর তিলক, গনেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে ও ডাক্তার বি এস মুঞ্জে কলকাতায় এলেন ৪ঠা জুন। উৎসবের সঙ্গে একটি স্বদেশী মেলারও আয়োজন করা হয়েছিল। ঐদিন অপরাহ্ণে তিলক মেলার উদ্বোধন করেন। উৎসবে ভবানী পূজারও ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিবাজী কবিতাটি পাঠ করেন এই উৎসবে। ৫ই জুন মূল উৎসবে পৌরোহিত্য করেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে সুরেন্দ্রনাথও একদিন উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিলক ও খাপার্দে নব্যদলের কর্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। অনুশীলন সমিতির সংগঠনী শক্তির প্রশংসা করে তিলক বলেন, "একদিন মারাঠারা বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিল কিন্তু আজ যদি বাংলাদেশ মহারাষ্ট্র আক্রমণ করে আমি বিস্মিত হব না।" এই উৎসবের অনুকরণে এই সময় হ'তে কিছুদিন বাঙ্গালীবীর প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম রায় প্রভৃতির উৎসব ও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এদের জীবন নিয়ে নূতন নূতন কয়েকখানি নাটকও রচিত হয়। সরলা দেবীর বীরাষ্টমী ব্রত এই সময় থেকেই উদ্‌যাপিত হতে থাকে।' সর্বত্র বীর পূজার সাড়া পড়ে যায়।

শিবাজী উৎসবে যোগ দিবার জন্য বিপিন পাল ও পি মিত্র পুলিন-দাসকে ডেকে পাঠালেন কলকাতায়। এই উপলক্ষে পি মিত্র, বিপিন পাল প্রভৃতি অনুশীলন সমিতির নেতাদের সঙ্গে তিলক, খাপার্দে, মুঞ্জে প্রভৃতির যে গোপন আলোচনা হয় সে সম্পর্কে পুলিনদাস লিখেছেন—

"একদিন তিলক, খাপার্দে এবং মুঞ্জে, পি মিত্রের সঙ্গে তাঁহার বাসাতে অনেক গুপ্ত আলোচনা করিলেন, আমি দ্বার রক্ষক ছিলাম, আনন্দ চক্রবর্ত্তী বাহিরে ছিলেন, অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিলনা। উচ্চ প্রশংসাসহ পি মিত্র আমাকে তিলক প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। গুপ্ত আলোচনা শেষ হইলে দেশের কথা গ্রন্থকর্ত্তা সখারাম গনেশ দেউশকারের সঙ্গেও আমার পরিচয় হইল। তিলক বলিয়া ছিলেন, ভারতের হিন্দুগণকে এক শক্তিতে পরিণত করিতে হইলে প্রথমতঃ সর্ব্বত্র দেবনাগরী অক্ষর প্রচলন করিতে হইবে, পরে সংস্কৃত ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগনের বিভিন্ন ভাষাকে মিলিত করিয়া একটি জাতীয় ভাষা করিতে হইবে।

বিপ্লব সমিতির প্রতিজ্ঞা

বিপ্লব সমিতির সভ্য হতে হলে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হতে হত। এতদিন পর্য্যন্ত অনুশীলন সমিতির সকল সভ্যদের জন্য একটি মাত্র প্রতিজ্ঞাই ছিল। শিবাজী উৎসবের সময় পুলিন দাস কলকাতা এলে কলকাতা সমিতির পরিচালক সতীশ বসুর সঙ্গে তাঁর আলোচনার পরে স্থির হয় যে সমিতির প্রতিজ্ঞাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হবে 'আদ্য প্রতিজ্ঞা' ও 'অন্ত্য প্রতিজ্ঞা'। নূতন সভ্যগণ সমিতিতে প্রবেশ কালে

আদ্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে এবং এদের ভিতরে যারা যোগ্য বিবেচিত হবে তাদেরই অন্ত্য প্রতিজ্ঞার পরে যথারীতি বিপ্লব ধর্মে দীক্ষিত বলে গ্রহণ করা হবে। এরা তখন সমিতির গুপ্ত বৈপ্লবিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং দেশদ্রোহী নিধন, অর্থ সংগ্রহার্থ ডাকাতি, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ এবং দুঃসাহসিক কার্য্য করবার অধিকারী হবেন।

বরিশাল সম্মেলন

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন। পুলিশের অত্যাচারে স্বেচ্ছাসেবকগণ এখানে সেখানে এর আগেও লাঞ্ছিত হয়েছিল কিন্তু নেতৃবৃন্দপরিচালিত শোভাযাত্রার উপর নির্মম যষ্টিপ্রহার এখানেই প্রথম। বরিশালের লাঞ্ছনা সমগ্র বাঙ্গালী চিত্তে জাতীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করছিল, এর ফলে যুবক সমাজ স্বতন্ত্র ভাবে চিন্তা করতে লাগল প্রতিকার, আর বিপ্লবী দলের লোক ও শক্তি সংগ্রহও এর ফলে সহজ হল। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এর অনুকরণে ১৮৮৮ সালে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয় বহরমপুরে। তারপরে কৃষ্ণনগর, চুঁচুড়া, চট্টগ্রাম, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে এর অধিবেশন হয়ে আসছিল ১৮৯৫ সাল হতে প্রতিবৎসর। আনন্দ মোহন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই সকল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯০৬ সালে ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল বরিশালে সম্মেলন হবে স্থির হল। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল এর সভাপতিত্ব করবেন। বরিশালের—নেতা অশ্বিনী কুমারের নেতৃত্বে সেখানে স্বদেশী

আন্দোলন এর আগেই এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে সরকার এ জিলাকে Proclaimed District বলে ঘোষণা করেন। এর অর্থ এই যে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী এই জিলা আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অঞ্চল।

সমগ্র বঙ্গে কার্জনী শাসনের ন্যায় পূর্ববঙ্গ তখন ফুলারী শাসন কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশ বিভক্ত হবার পরে পূর্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের জন্য শাসক নিযুক্ত হলেন স্যার ব্যামফিল্ডফুলার। ফুলার একদিকে যেমন দোর্দণ্ডপ্রতাপে আন্দোলন দমন করতে সুরু করলেন, অন্যদিকে তেমনি হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করে মুসলমানকে এ আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করলেন।

বরিশাল সম্মেলনের সময়ে ফুলারী নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র পূর্ববঙ্গে বন্দেমাতরম ধ্বনি নিষিদ্ধ। সম্মেলনের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা কালে বন্দেমাতরম ধ্বনি করা হবে না এই সর্ত্তেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার অনুমতি পাওয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, টাকীর জমিদার যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, বিপিন চন্দ্র পাল, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, যাত্রা মোহন সেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ষ্টিমার যোগে বরিশাল পৌছলেন ১৩ই এপ্রিল। সর্ত্ত অনুযায়ী ষ্টেশনে বন্দেমাতরম ধ্বনি হলনা। কিন্তু এ ব্যাপারে এন্টি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যগণ সন্তুষ্ট হতে পারলেননা! স্বদেশী আন্দোলন থেকে ছাত্র সমাজকে দূরে রাখবার জন্য ভারত সরকার জারী করে ছিলেন রিজলী সার্কুলার, বাংলা সরকার জারী করেছিলেন কার্লাইল সার্কলার এবং নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার জারী করেছিলেন লায়ন সার্কুলার। এই সমস্ত সার্কুলার অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের বহু ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবার অপরাধে লাঞ্ছিত হতে লাগল। রংপুর ও ঢাকায় বহু ছাত্র স্কুল থেকে

বিতাড়িত হল, এদের মধ্যে কেহ কেহ আবার বেত্র দণ্ডে দণ্ডিত হল। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের ছাত্র বলে দেব প্রসাদ ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েটে প্রথম হয়ে ও সরকারী বৃত্তি থেকে উভয় বারই বঞ্চিত হলেন।

এরই প্রতিবাদে এই সময় কলকাতায় গড়ে উঠেছিল এন্টি সার্কুলার সোসাইটি কৃষ্ণ কুমার মিত্রের নেতৃত্বে। কৃষ্ণকুমার বয়সে প্রবীণ হলেও মানসিক দিক থেকে নবীন দলভুক্ত ছিলেন। তিনিই এ সমিতির সভাপতি হলেন, সম্পাদক হলেন তাঁরই জামাতা শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। সমিতির সদস্য অধিকাংশই যুবক ও ছাত্র। স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যে এ সমিতির দান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিলাতী বর্জনকে সফল করে তুলতে দোকানে দোকানে পিকেটিং করবার রীতি এদেরই প্রবর্ত্তন। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যে প্রতিবাদ মাত্র নাহয়ে অনেকটা বৈপ্লবিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল, তা অনেকটা এই সমিতির জন্যই।

বরিশালের নেতৃবৃন্দের কার্য্যের প্রতিবাদে এন্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করলেননা। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ, বরিশালে স্বদেশী অন্দোলনের অন্যতম নেতা রজনীকান্ত গুহ এদের নিজ গৃহে ডেকে নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণকুমারও এদের সঙ্গেই গেলেন। বহু আলোচনার পরে দুইদলের মধ্যে একটি মীমাংসা সম্ভব হল। স্থির হল রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে সবাই সমবেত হয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি করবেন। তারপর শোভাযাত্রা করে সভামণ্ডপে গমন করবেন। যথা সময়ে শোভাযাত্রা বের হল। প্রথম গাড়ীতে ছিলেন সভাপতি আব্দুল রসুল ও তাঁর ইউরোপীয় পত্নী। এর পশ্চাতেই পদ ব্রজে চলছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ও

ভূপেন্দ্রনাথ বসু। শোভাযাত্রার সর্বপশ্চাতে ছিল এন্টি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যগণ এবং এদের সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, রজনীকান্ত গুহ, এবং গাস্পতি কাব্যতীর্থ। নেতৃবৃন্দের নির্দেশানুযায়ী এন্টি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যগণ বন্দেমাতরম ধ্বনি করলেন না কিন্তু শোভাযাত্রায় তারা বন্দেমাতরম ব্যাজ পরে যাবেন স্থির করলেন। শোভাযাত্রার প্রথমাংশ অগ্রসর হল কিন্তু এন্টি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যদের ব্যবহার দেখেই পুলিশ তাদের প্রহার করতে আরম্ভ করল। প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে তারাও বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগল। বহু লোক আহত হল। কিন্তু ফনীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বেচারাম লাহিড়ী, ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার আঘাতই গুরুতর হল। চিত্তরঞ্জন লাঠির ঘায়ে পুকুরের মধ্যে ছিট্‌কে পড়লেন এবং সেখানথেকেই বন্দেমাতরম ধ্বনি করতে লাগলেন। পুলিশ তাকে সেখানে রেখেই যষ্ঠি প্রহার করতে লাগল। শোভাযাত্রার মধ্য থেকে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথকেই গ্রেপ্তার করা হল। ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সনের ভবনে নিয়ে গিয়ে তখনই বিচার হল তাঁর। বিচারে দু'শ টাকা জরিমানা হল বেআইনী শোভাযাত্রা পরিচালনার অপরাধে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ একখানি চেয়ারে বসতে গেলে আদালত অবমাননার অপরাধে আরও দু'শ টাকা জরিমানা হল তাঁর।

কিন্তু এর শেষ এখানেই হলোনা। পরদিন অধিবেশন আরম্ভ হলে পুলিশ সুপার স্বয়ং এলেন সভামণ্ডপে। তিনি জানালেন, 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করা হবেনা এই সর্তে রাজি না হলে তিনি সম্মেলন হতে দিবেন না। কিন্তু এবার নেতৃবৃন্দও এই হীন সর্তে সম্মত হলেন না। ফলে সম্মেলনের অধিবেশন এখানেই শেষ হল। কিন্তু বেআইনী আদেশ অমান্য করে সম্মেলনের কাজ চালাবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত যারা বসেছিলেন তাদের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র অন্যতম।

বরিশাল সম্মেলন অসমাপ্ত শেষ হল বটে কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া সমগ্র বঙ্গের উপরে ফলতে বিলম্ব হলনা। এন্টি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যগণ আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বরিশাল থেকে ফিরে এলেন। বরিশালের পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী সমগ্র বাংলায় প্রচারিত হল। কলকাতায় ও মফস্বলে বহু সভাসমিতি হল এর প্রতিবাদে। স্বদেশী আন্দোলনে পূর্ণ বেগ সঞ্চারিত হল এর ফলে। যুবক সমাজের মনেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ফলে বাংলায় বিপ্লবান্দোলনেও এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। এতদিন পর্য্যন্ত এরা বিপ্লবের সংগঠনী কার্য্যে রত ছিল কিন্তু এবারে প্রকৃত বৈপ্লবিক কার্য্যক্ষেত্রে নামবার প্রয়োজন বোধ করল তারা।

এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন—"১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল বরিশাল কনফারেন্সে পুলিশের লাঠির ঘায়ে দেশযজ্ঞ পণ্ড হলো। এই ঘটনার ফলে বহু নরমপন্থীকে উগ্রপন্থীতে পরিণত করে। বরিশালের পুলিশ সুপার মিঃ ক্যাম্প ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমার্সন এই যজ্ঞ মণ্ডপে আগুন দিবার বৈধ আইনের ছিলেন ভাড়াটে গুণ্ডা, সেখানে সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার প্রভৃতি নরমপন্থীর উপর চললো উৎপীড়ন। অরবিন্দ এ দক্ষযজ্ঞনাশের ছিলেন নীরব নির্বাক দ্রষ্টা।" বরিশাল সম্মেলনে অরবিন্দ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনও বরোদা কলেজের চাকুরী ত্যাগ করেননি। কিন্তু সম্মেলনে যোগদানের জন্যই কলকাতা হয়ে বরিশাল যান।

কিন্তু বাংলা দেশের আকাশে বিপ্লবের রক্তরাঙা মেঘ দেখা দিয়েছিল এরও আগে ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনাময় তপ্ত প্রবাহে দেশের যুবকচিত্তকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অনুশীলন সমিতির সভ্যরা সে আন্দোলনের গতি প্রবাহ থেকে আত্মরক্ষা

করতে পারেনি। দেশময় যে উত্তেজনার আগুন জ্বলে উঠল তাতে প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। তাই তাদের সশস্ত্র বিপ্লবায়োজন চেষ্টা কিছুদিনের জন্য গিয়েছিল থেমে। কিন্তু অচিরেই তারা বুঝল এপথ উদ্দেশ্য সাধনের পথ নয়। কিন্তু এদিকে সরকারী রুদ্ররোষ ফেটে পড়ছে চারদিকে। যুবকচিত্তে চলল এর প্রতিকার পন্থার সন্ধান—এর ফলেই আরম্ভ হলো বোমা তৈরীর আয়োজন।

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় সে অগ্নিযুগেরই বাহ্যধারা। ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হ'তে ১৯০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর ধরে গড়ে উঠেছিল এ আন্দোলনের ভিত্ত। প্রধূমিত অগ্নিরাশি তখনও প্রচ্ছন্ন ছিল জাতির অন্তরে, বঙ্গভঙ্গকে অবলম্বন করে আগুন আত্মপ্রকাশ করেছিল মাত্র। এই আন্দেলন সম্পর্কে দেশবন্ধু বলেছেন—"প্রাণের যে বন্যা, সে তো অঙ্কশাস্ত্র মানেনা, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে তখন হিসাব করিয়া জাগেনা।" সত্যই স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ বাঙালী সেদিন উপলব্ধি করতে পারে নাই। অগ্নি প্রজ্বলিত দেখে সে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এর ভালমন্দ পরিণতি বুঝে দেখবার অবসর ছিলনা তার। বাংলার জাতীয় জীবনে এযুগ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার বলেছেন—"তখন বাঙ্গলা দেশে ভাঙনের দেবতা নটরাজ তাণ্ডবনৃত্যে তাথাথৈ, তাথাথৈ নৃত্যশীল, জাতির মনপথ দ্রুত একটি একটি করে তার শতদল মেলছে, ভাবগঙ্গার সঞ্জীবনী স্পর্শে মায়ের মরা ছেলে সব প্রাণ পাচ্ছে।" স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাংলা সহজ প্রকাশের সুযোগ না পেয়েই, আপন বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজে নিল বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে।

আন্দোলন হিসাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাহ্যতঃ ব্যর্থ হলেও বাংলায় বিপ্লবযুগ সৃষ্টিতে এর দান অপরিসীম। ফলতঃ, এই আন্দোলনের মধ্যেও চলেছে গোপন বিপ্লব প্রচারের প্রচ্ছন্ন কাজ। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কনফারেন্স হল মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরে এর আগেই বিপ্লবীদল দানা বেঁধেছে। সত্যেন বসুর নির্দেশে বালক ক্ষুদিরাম গেল কনফারেন্সের কৃষি প্রদশনীতে গোপন প্রচারপত্র 'সোনার বাংলা' ও '**No Compromise**' প্রচার করতে। ক্ষুদিরাম এখানে ধরা পড়ে কিন্তু সত্যেন বসুর চেষ্টায় মুক্তি পায়। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সত্যেনকে সন্দেহ করে তার কালেকটরীর কেরাণীগিরি চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে দেন।

অনুশীলন সমিতিতে ভাঙ্গন

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিককার উন্মাদনা কতকটা শিথিল হলে যুবক সমাজ আবার মনদিন বিপ্লবায়োজনে। পি মিত্রের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির সভ্যদের লাঠি ও ছোরা খেলা পুনরায় আরম্ভ হল। কিন্তু স্বদেশীর প্রধূমিত অগ্নি তখন জাতির অন্তরে। তাই লাঠি ও ছোরা নিয়ে মেতে থাকতে যুবকদল অসম্মতি প্রকাশ করল। বারীন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে একদল যুবক সভাপতি পি মিত্রকে সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন—দেশকে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করতে লাঠি ও ছোরা খেলাই যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের নবমন্ত্র দেশময় প্রচার করতে হবে, এরজন্য চাই বাহন, চাই প্রচারপত্র। তারা যুগান্তর নামে খোলাখুলি বিপ্লবপন্থী কাগজ প্রকাশ করবেন জানিয়ে দেন পি মিত্রের কাছে। কিন্তু পি মিত্র এতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন—জাতীয় জীবনে বিপ্লব বইবে গোপন

ধারায়, গোপনে গোপনে চলবে এর জন্য প্রস্তুতি। তারপর ভূমিকম্পের মত একদিন চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে জ্বালিয়ে দিবে ধ্বংসের আগুন। সমস্ত অন্যায়, অনাচার, অশুভ সে আগুনে পুড়ে যাবে, জাতীয় জীবন সোনার ন্যায় খাঁটি হয়ে উঠবে। তিনি বারীন্দ্রের দলকে এপথ থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু যখন বুঝলেন, এই ক্ষ্যাপা যুবকদল কোন কথাই শুনবেনা, বন্ধুবান্ধব ও কর্মী মহলে ঠাট্টা করে বললেন,—"বারিন দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ভারত উদ্ধার করবে।" কিন্তু বারীন্দ্রকুমারও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি জবাবে বললেন—"পি মিত্র সাহেব বাঁশের লাঠি ঘুরিয়েই দেশ উদ্ধারের পালা সারবেন।" ক্রমে বিভেদ সুস্পষ্ট আকার নিল। দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে একদল যুবক মূল অনুশীলন সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করলেন ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে।

লাঠি ও ছোরা খেলার মধ্য দিয়ে বিপ্লবায়োজন বারীন্দ্রকুমারকে কোনদিনই বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি। বরোদা থেকে বাংলায় এসে এখানে এই লাঠি ছোরা খেলার প্রাধান্য দেখেই তিনি আবার ফিরে গিয়েছিলেন বরোদায় এখানে বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে। কিন্তু বিপ্লবের নেশা তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। তাই বরোদা গিয়েও তিনি আবার চুপ করে বসে থাকতে পারলেননা। আবার ফিরে এলেন বাংলা দেশে বিপ্লবমন্ত্র প্রচারের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। এ সম্পর্কে তিনি আলিপুর বোমার মামলায় আপন স্বীকারোক্তিতে বলেছেন—

আমি যখন ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসি তখন আমার বয়স এক বৎসর মাত্র। দেওঘর স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি ঢাকা সহরে আমার অগ্রজ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের নিকট গমন

করি এবং সেই সময়েই আমি ফার্ষ্ট আর্টস পড়িতে কলেজে প্রবেশ করি। তাহার পর লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া আমি বরোদা রাজ্যে আমার ভ্রাতা গাইকোয়াড় কলেজের অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের নিকট গমন করি। সেখানে আমি ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠে মনোনিবেশ করি। তাহার পর রাষ্ট্রীয় প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার বার্ত্তা প্রচারের জন্য আমি বাংলা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি। আমি জেলার পর জেলা ঘুরিয়া প্রচার চালাই এবং দিকে দিকে ব্যায়ামশালা স্থাপন করি। সেখানে যুবকদের দলে আনিয়া রাষ্ট্রনীতি ও শরীর চর্চা শিক্ষা দেওয়া হইত। এইভাবে দুই বৎসরকাল আমি প্রচার চালাই এবং এরূপে আমি বাংলায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি। ক্লান্ত ও পরাজিত মনে আমি বরোদায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আরও নিবিষ্টমনে পড়াশুনা করতে থাকি। এক বৎসর এরূপভাবে কাটাইয়া আমি নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলা দেশে ফিরিয়া আসি। আমি হৃদয়ঙ্গম করি যে, শুধু স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইলে সফলকাম হওয়া যাইবেনা, ইহাতে যে বিপদ আছে তাহার সম্মুখীন হইতে হইলে জাতিকে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিতে হইবে ও অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে এবং আত্মিক বলে বলীয়ানও হইতে হইবে। সেজন্য ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্রের বিশেষ প্রয়োজন। ঠিক এই সময়ে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন আন্দোলন প্রবলভাবে বাংলা দেশে আত্মপ্রকাশ করে। আমি জনগণকে আমার পন্থায় শিক্ষিত করিবার আশায় লোক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম এবং যে সমস্ত লোক বর্ত্তমানে আমার সঙ্গে গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহাদের এই জন্যই আমি সংগ্রহ করি। আমার বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বর্ত্তমানে আমার সহিত ধৃত) এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (বর্ত্তমানে কারাগারে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী) সহযোগিতায় যুগান্তর প্রকাশ

করি। দেড় বৎসরকাল ঐ পত্রিকা চালাইবার পর বর্ত্তমান পরিচালকগণের উপর উহা চালাইবার ভার অর্পণ করিয়া আমি 'যুগান্তর' ছাড়িয়া বিপ্লবী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। ১৯০৭ সালের প্রথম দিক হইতে ধরা পড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি ১৪।১৫টি তরুণকে সংগ্রহ করিয়া দলভুক্ত করি ও ইহাদের রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করি। সুদূর এক ভবিষ্যতে বিপ্লব ঘটাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা ধীরে ধীরে স্বল্প কিছু অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকি। এভাবে এপর্য্যন্ত আমরা ১১টি বিভলবার, ৪টি রাইফেল ও একটি বন্দুক যোগাড় করিতে পারিয়াছি।"

বারীন্দ্রকুমার নিজেই বলেছেন, ১৯০১ সালের গোড়ার দিকে তিনি বাংলায় বিপ্লব প্রচারের উদ্দেশ্যে বরোদা থেকে এখানে আসেন। এর পর দুই বৎসর বাংলায় থাকার পর এক বৎসর বরোদায় থেকে তিনি দ্বিতীয়বার বাংলা দেশে আসেন। সুতরাং এই হিসাবে ১৯০৬ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশে তাঁর দ্বিতীয়বার পদার্পণ। যুগান্তর পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে। সুতরাং দ্বিতীয়বার বাংলা দেশে এসে বারীন্দ্রকুমার পি মিত্রের সঙ্গে একযোগে বেশীদিন কাজ করেন নাই! যে দুই এক মাস তারা একসঙ্গে অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন তাও বিরোধের মধ্যদিয়ে কাটে। এ সম্পর্কে তিনি অন্যত্র লিখেছেন—

"বাংলা দেশে দ্বিতীয়বার এসে আমি দেবব্রতকেই খুঁজে বাহির করি। দেবব্রতের বাড়ী ছিল ষ্টার থিয়েটারের পিছনে। কাজেই আমাদের নূতন কেন্দ্রের বাড়ী খুঁজে বার করা হলো দেবব্রতেরই কাছে গ্রে ষ্ট্রীট ও রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে রাজাদের একটি ঘোড়ার আস্তাবলের উপরে। একখানি বড় হল, রাস্তা থেকে সরু গলিতে সিঁড়ি উঠে

গেছে উপরে! এই ঘরখানিতেই থাকতাম আমি ও দু' একটি কর্মী। খুলনার সুধীর ছিল আমার সঙ্গে। একটি জোড়া তক্তপোষের উপর আমরা শয়ন করতাম। ষ্টোভ ও কুকারে আমরা রেঁধে খেতাম। * * * তখন যতীনদা প্রব্রজ্যায় চলে গেছেন। আমাদের বাংলা কেন্দ্রের সভাপতি সাহেব পি মিত্র মশাই ডুবে আছেন তার অনুশীলন সমিতির লাঠি ছোরা খেলার কাজে। আবার আমি এসে পূব যোগাযোগ স্থাপন করলাম বটে কিন্তু কার্য্যতঃ এবারকার নেতা ও চালক হলেন শ্রীঅরবিন্দ।"

কিন্তু বারীন্দ্রকুমার এখানে ভুল করেছেন, অরবিন্দ তখনও বরোদা থেকে কার্য্য ছেড়ে বাংলায় আসেননি। তিনি এসেছিলেন যুগান্তর প্রকাশিত হবারও মাস কয়েক পরে। বারীন্দ্রের দল এর আগেই অনুশীলন সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে! এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার নিজেই অন্যত্র বলেছেন—"গোটা ১৯০৫ সাল জুড়ে এই বৈশ্বানরী লীলা যখন চলছে তখন আমরা এরই আড়ালে এই হাওয়ার পাল তুলে দিয়ে আমাদের বিপ্লবের রক্তরাঙা ডোঙা ভাসিয়েছি। অরবিন্দ ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে এসে বাংলার গুপ্ত ও ব্যক্ত দুই আন্দোলনেরই নেতৃত্ব যুগ্মভাবে হাতে তুলে নেবেন—তারই পটভূমি তৈরী করছিলেন দেশের যুগদেবতা এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। * * * এ ধারাকে বৈশ্য আন্দোলন বলে আমরা ১৯০৫ সালে উপহাস করলেও, ১৯০৬ সাল থেকে এ আন্দোলন বৈপ্লবী আভায় অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। এই উত্তাল তরঙ্গই বরোদায় মোটা মাহিনার চাকুরী থেকে অরবিন্দকে টেনে এনেছিল বাংলায় স্বদেশীর আবর্ত্তে।"

পি মিত্রের সঙ্গে মতান্তর সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন—১৯০৬ সালের গোড়ায় পি মিত্র মহাশয়ের লাঠি খেলার ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিতে

আমাদের অরুচি ধরে এলো। আমি ও দেবব্রত দেখলাম—এ পন্থায় দাগা বুলানোয় দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগোবেনা। দেশকে সশস্ত্র অভিযানের মর্ম কথা বোঝানো দরকার। এতদিন দু' দশজন গুপ্ত প্রচারকের দ্বারা জনে জনে যেভাব সঞ্চারিত করা হচ্ছিল—সে উপায়ও দ্রুত দেশের মন নূতন বিপ্লবতার অনুকুল করে শীঘ্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই নূতন পন্থা, নূতন ভাব, নূতন মন্ত্রের চাই উপযোগী বাহন—তার বাণীপত্র। সন্ধ্যায় সামাজিক ফৈরঙ্গীবিদ্বেষবুলি শুনতে শুনতে আমি, দেবব্রত, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, আমাদের জনৈক কবিরাজ বন্ধু ও মুনসেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর মধ্যে পরামর্শ করে স্থির হলো যে 'যুগান্তর' নাম দিয়ে খাঁটি সশস্ত্র বিপ্লবতন্ত্রের কাগজ বাহির করতে হবে। * * * আমাদের যুগান্তরী মন্ত্রণা পেকে উঠলো, প্রেসিডেণ্টের আড্ডায় গমনাগমন আমরা ত্যাগ করলাম।"

১৯০৬ সালের মাচ মাসে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ এই সঙ্কল্পেরই ফল।

বিপ্লবের পাঞ্চজন্যয়ত্রী

যে পাঞ্চজন্য ত্রয়ীর বজ্রনির্ঘোষে বাংলায় সেদিন অগ্নিযুগের শুভ উদ্বোধন হয়েছিল, তাদের মধ্যে 'সন্ধ্যা' অগ্রজ। বাংলার আকাশ, বাতাস প্রতিধ্বনিত করে বেজে উঠল বিপ্লব শঙ্খ, একের পর একটি—সন্ধ্যা, যুগান্তর এবং বন্দেমাতরম। বিপ্লবের যুগদেবতা সাড়া দিলেন সে আবাহনে। আত্মপ্রত্যয়হীন, মোহমুগ্ধ বাঙালীর জাতীয় জীবনে হলো বিপ্লবরথের জয়যাত্রা সুরু।

নবযুগে, নবমন্ত্রের বাহন এই তিনখানি পত্রিকার মধ্যে 'সন্ধ্যা' এবং

'যুগান্তর' বাংলা সাপ্তাহিক, এবং 'বন্দেমাতরম' দৈনিক ইংরেজী ভাষায়। তিনটি পত্রিকা কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত। 'সন্ধ্যা' প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। এই পত্রিকাখানির ক্রমপরিনতির একটা ইতিহাস আছে। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তিনি বহু ধর্মমতকেই আন্তরিকভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং শেষে হিন্দুধর্মের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সাধনালব্ধ সত্যের সন্ধান। ভাবমুগ্ধ সন্ন্যাসী তাই হিন্দু ধর্মমত প্রচারের জন্য ক্রমে উগ্র হ'তে উগ্রতর হয়ে উঠল। যা কিছু বিদেশী, যা কিছু অভারতীয় তাই আমাদের ভুলতে হবে, তাই ঘৃণা করতে হবে অন্তরের সহিত—এই ছিল তাঁর প্রচার এবং মনে প্রাণে একেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই পথে পথে চলতে চলতেই তিনি এর স্বাভাবিক পরিণতিরূপে ক্রমে ঘোর ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে পড়লেন।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করেই ব্রহ্মবান্ধব ধর্ম প্রচারের ব্রত নিয়েছিলেন এবং এজন্য সন্ন্যাসী বেশে তিনি ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করেন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতেই ১৯০২ সালের এক সময়ে তিনি বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই বিবেকানন্দ যখন দেহত্যাগ করেন ব্রহ্মবান্ধব তখন কলকাতায়। কলকাতায় পথে চলতে চলতে হঠাৎ লোকমুখে সংবাদ পেয়ে তখনই ছুটে গেলেন বেলুড়ে। যে মহাপুরুষ হিন্দু ধর্মকে সমগ্র জগতের দৃষ্টিতে দিয়েছেন অপূর্ব শ্রদ্ধার আসন, তাকে শেষবার দেখবার দুদম আকাঙ্খা নিয়ে উপস্থিত হলেন তার শেষ শয্যাপার্শ্বে। এখানে বসে সন্ন্যাসীমন তাঁর নিমগ্ন হল অপূর্ব চিন্তায়—এই সেই বিশ্ববিজয়ী বীর—হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী যিনি উড়িয়েছেন সমগ্র বিশ্বে—ইউরোপ ও মার্কিণ

মুলুকে। ভাবতে ভাবতে মনে হল তাঁর—বেদান্ত কেশরী'র কার্য্য আজও তো সমাপ্ত হয়নি, সমগ্র জগতে হিন্দুধর্মের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব তো আজও প্রতিপাদিত হয়নি। ভাবতে ভাবতে প্রেরণা পেলেন অন্তরে এ অসমাপ্ত কার্য্য তাঁকেই সমাপ্ত করতে হবে—এই বিশ্বাস নিয়েই ফিরে এলেন তিনি বেলুড় থেকে।

এরপরে এই হল তার দিনরাত্রের চিন্তা—কি করে এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করবেন তিনি। শেষে স্থির করলেন এজন্য ইউরোপ যেতে হবে তাঁকে। কিন্তু তার জন্য অর্থ কোথায়? কিন্তু সংকল্প যখন স্থির হয়েছে অর্থাভাবে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করবে কেমন করে? মাত্র ২৭৲ টাকা পকেটে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব বিলেত যাত্রা করলেন ৫ই অক্টোবর এবং ৫ই নভেম্বর পৌঁছলেন অক্সফোর্ডে। এখানে এক মাসের মধ্যে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিলেন—"হিন্দুধর্মে ঈশ্বরবাদ", "হিন্দুর নীতিশাস্ত্র" এবং "হিন্দুর সমাজ বিজ্ঞান"। এরপরে তিনি কেম্ব্রিজে গিয়ে সেখানেও তিনটি বক্তৃতা দিলেন—"হিন্দুর ধর্মনীতি", "হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্ম" এবং "হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব"। এই প্রচারে কতকটা সুফল ফলতে বিলম্ব হলনা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হলো।

১৯০৩ সালে ব্রহ্মবান্ধব যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তিনি নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু। ১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় এলবার্টহলে বক্তৃতা দিলেন। বিষয়—"শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব"। এই বক্তৃতায় পরে হিন্দু সমাজে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে গেল। রোম্যান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীকে হিন্দু সমাজ নিষ্ঠাবান হিন্দুরূপেই গ্রহণ করে নিল। বিলেতে অবস্থানকালে ব্রহ্মবান্ধব নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখতেন 'বঙ্গবাসী'তে। এই সকল প্রবন্ধে তিনি বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, এমন কি হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্যতা পর্যন্ত সমর্থন করতেন। ১৯০৫ সালে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ

করবার সময়ে তিনি মুখবন্ধে লিখেন—"যাহা শুন যাহা শিখ—যাহা কর, হিন্দু থাকিও, ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতি মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না।" হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে খাঁটা ও অকৃত্রিম রাখতে হবে। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আক্রমণ থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, যেখানেই পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতীয়তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে, নির্ম্মমভাবে তাকে ধ্বংস করবে, সর্বপ্রকার ইংরিজিয়ানাকে সর্বতোভাবে বাধা দিবে, হিন্দু ধর্ম্মের সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানকে প্রাণপনে রক্ষা করে চলবে— এই ছিল সন্ধ্যা পত্রিকার মতবাদ।

কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় প্রকাশিত বলে ব্রহ্মবান্ধব পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন 'সন্ধ্যা'। এর সম্পাদনা ও পরিচালনায় ব্রহ্মবান্ধবের সহকারী ছিলেন—পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, মোক্ষদা প্রসাদ সমাধ্যায়ী, বলাই দেবশর্ম্মা এবং মানব চট্টোপাধ্যায় বা স্বামী বিত্থানন্দ। এ ছাড়া অনিমানন্দ নামে এক জন খৃষ্টান সাধুও এ কার্য্যে ব্রহ্মবান্ধবকে সাহায্য করতেন। অনিমানন্দ ছিলেন সিন্ধুদেশবাসী।

নরমদল ও গরমদল

প্রকাশ্য রাজনীতিতে নরম এবং গরম দল সৃষ্টি হয়েছে তখন। নরম দল মনে করলে, বিলাতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তথাকার জনমত গঠন করা প্রয়োজন। বিলেতের জনমত একবার ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হলেই এর সমাধান হবে। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে প্রবীণ নেতা দাদাভাই নৌরজীও এই কথাই বললেন— "আন্দোলন কর, প্রবল আন্দোলন কর। গণতন্ত্রপরায়ণ বৃটিশ জাতি

আন্দোলনের নিকট যেভাবে মস্তক অবনত করে এমন আর কিছুর নিকটই করেনা, আন্দোলন সর্বতোভাবে গণতন্ত্র সম্মত এবং উপদ্রব-বিহীন হওয়া আবশ্যক। ভারতবাসীরা বৃটিশ প্রজা, বৃটিশের সমানাধিকার তাদের ন্যায্য প্রাপ্য।" কিন্তু গরমদল বা চরমপন্থীরা এমত বিশ্বাস করতেন না। এদের নায়ক ছিলেন মহারাষ্ট্রের তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং বাংলাদেশে বিপিনচন্দ্র পাল। পুরাতনপন্থীদের নেতা ছিলেন স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের নায়ক হলে ও কংগ্রেসী রাজনীতিতে তাঁরা ছিলেন ফিরোজ শাহ মেহতারই সমর্থক। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে সমগ্র ভারতের কংগ্রেসী আন্দোলনে তখন এই নরম ও চরম পন্থীদের মতভেদ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করছে। পুরাতন ভাবধারায় সঙ্গে পার্থক্য কি এবং নূতন দলের উদ্দেশ্য কি এ সম্পর্কে নেভিনসন নামক একজন ইংরেজ সাংবাদিকের নিকট তিলক বলেন, "আমরা জানি, ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারত শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। * * * এদিকে হতাশ হয়েই আমরা অন্য পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের আদর্শ—আত্মনির্ভরতা, ভিক্ষাবৃত্তির তিরোধান। বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আমাদের অস্ত্র। কারো উপর বলপ্রয়োগের আমরা পক্ষপাতী নই। কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে যদি দুঃখবরণ করতে হয় তাতেও আমরা পশ্চাদপদ হবনা।"

১৯০৬ সালের মাঝামাঝি অরবিন্দ বরোদা থেকে চাকুরী ছেড়ে এসে এই নূতন দলে যোগ দেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি নূতন দলের সমর্থক হলেও তাঁর নিজস্ব মতবাদ পার্থক্য ছিল। তাঁর কাছে রাজনীতি নিছক রাজনীতিই নয়। নূতন ভাবধারাকে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত করলেন। তিনি বললেন—"জাতীয়তাবোধ বা দেশভক্তি

একটি ধর্ম, ঈশ্বর হতে উদ্ভূত। জাতীয়তাকে কেউ রোধ করতে পারেনা, কেননা, ঈশ্বরই একে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। * * * দৃশ্যমান শক্তিসমূহের চেয়ে স্বদেশের শক্তি অন্যবিধ। দেশমাতৃকার শক্তি নিজস্ব। এর পরিপুষ্টির জন্য আমার আবশ্যক নেই, তোমার আবশ্যক নেই, অন্য কারও আবশ্যক নেই।"

বিপ্লবে ধর্মীয় প্রভাব

ভারতীয় রাজনীতিতে পরবর্ত্তীকালে যে ধর্মভাবের প্রভাব আমরা দেখি এখানেই তার আরম্ভ। প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার যোগাযোগ রক্ষা করলেন শ্রীঅরবিন্দ। বারীন্দ্রের দল অনুশীলন সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে অরবিন্দের নির্দেশেই পরিচালিত হতে থাকে। পুলিন দাসের কথায় পি মিত্র এবং অরবিন্দ দলের নেতা কে হবেন—এ নিয়ে পার্থক্যই দল বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনও ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলায় তথা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল অসামান্য। বাংলায় বিপ্লবান্দোলনে ধর্মীয় প্রভাবের এও অন্যতম কারণ।

এইভাবে রাজনৈতিক উগ্রমতবাদের সঙ্গে ধর্মীয় আন্দোলনের এক সমন্বয় ঘটেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে 'সন্ধ্যা' ছিল চরমপন্থীদের সমর্থক। তার উপর নৈষ্ঠিক হিন্দুত্ববাদী এবং উগ্র ফিরিঙ্গি—বিদ্বেষী হওয়ায় তার বিপ্লবপথে ক্রমপরিণতি লাভ সহজ হয়েছিল। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের পরে এই পরিণতি সুস্পষ্ট

রূপ গ্রহণ করে। যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদিই এর কারণ। ব্রহ্মবান্ধবের অনুপস্থিতিতে একবার সন্ধ্যার পরিচালনাভার পড়ে যুগান্তর অফিসের উপর। ফলে যুগান্তরী অনলস্রাবী প্রবন্ধমালা এর কলেবর বৃদ্ধি করতে লাগল। এর মধ্যে "কালীমাই কি বোমা" প্রবন্ধ সে যুগে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বারীন্দ্রকুমার বলেন, "আমরা প্রায় রাতারাতি এই অবসরে সন্ধ্যাকে কালীমাইর বোমার ওকালতিতে নামিয়ে দেই। ব্রহ্মবান্ধব ফিরে এসে খুসী হয়ে অবিনাশকে বললেন, 'তা বেশ করেছ, এখন থেকে সন্ধ্যা গরম সিডিশনই চালাবে।' " ১৯০৭ সালের প্রথমদিকে সন্ধ্যায় আরও কয়েকটি প্রবন্ধে বোমার কথা লেখা হয়। এইসকল প্রবন্ধে স্পষ্টভাষায় উল্লেখ ছিল যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শক্তিসম্পন্ন বোমা তৈরী হয়েছে দেশে এবং এই বোমা সংগ্রহ করে ঘরে রাখা প্রত্যেক দেশভক্তেরই কর্তব্য। এইভাবে গরমপন্থী নৈষ্টিক হিন্দুপত্রিকা সন্ধ্যা বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষালাভ করে। এই সময় থেকে সন্ধ্যা সমগ্র দেশে বিপ্লবমন্ত্র প্রচারের ভার নিলেও ব্রহ্মবান্ধব স্বয়ং বিপ্লব দলভুক্ত হয়ে কোন কাজ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবান্ধব স্বয়ং কোন বিপ্লব দলভুক্তই ছিলেন না।

১৯০৭ সালের প্রথম দিকেই দেশে গরমপন্থী দলের কার্য্যের প্রতি সরকারের দৃষ্টি পড়ল। এই সময়ের সরকারী নীতি হল, শাসনকার্য্যে কিছুটা সুবিধা দিয়ে নরমপন্থীদের সরকারী অনুবর্ত্তীকরে নিতে হবে এবং তারপর চরমপন্থীদের প্রতি অত্যাচার চালিয়ে দেশ থেকে এ আন্দোলনের উচ্ছেদ করতে হবে। ভারত সচিব তখন লর্ড মর্লি— প্রথমোক্ত কথা তারই নিজের মুখের। পাঞ্জাব, বাংলা এবং বোম্বাই— এই তিনটি প্রদেশে একসঙ্গে সমানে কার্য্য সুরু হল। রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঞ্জাবের 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর

এবং 'পাঞ্জাবী' পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক দণ্ডিত হলেন। এখানে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছিলেন গবর্ণমেণ্ট এই সময় এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়। ১৯০৭ সালের ৯ই মে এজন্য লাজপত রায়কে ১৮১৮ সালের ৩ আইনে বন্দীকরে পাঞ্জাবে নিবাসিত করা হল। সর্দার অজিত সিংহকেও এই আইনে গ্রেপ্তার করা হল।

বাংলা দেশে 'যুগান্তর' এবং 'বন্দেমাতরম'-এর সঙ্গে সন্ধ্যা তখনও 'সিডিশন' চালাচ্ছে। 'সন্ধ্যা' তার আদিপবের গুরুগম্ভীর বৈদান্তিক ভাষা ত্যাগ করে আপামর জনগণের বোধগম্য এক মুখরোচক চলতি ভাষা গ্রহণ করেছে। তাই শিক্ষিত, অশিক্ষিত উভয় সমাজে তার সমান আদর। রোমান ক্যথলিক সন্ন্যাসীর প্রাণগড়া মধুর ভাষায় যে ফিরিঙ্গি বিদ্বেষ প্রচার চলছিল আজও তার রেষ জনতার মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়।

ফিরিঙ্গি আমার পরম দয়ালু।
ফিরিঙ্গির কৃপায় দাড়ি গজায়—
শীতকালে খায় শাঁক-আলু!

আজও শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকের মুখে এ আবৃত্তি শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা জানেনা যে ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'ই তাদের এ শিখিয়েছে। যে দুটি প্রবন্ধের জন্য সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদকরূপে ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেপ্তার করা হয় তার একটি প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল উপরের তিনটি লাইন এবং অন্য একটি প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল—"ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে।"

'সন্ধ্যা' জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় যখন রাজদ্রোহ প্রচার করছিল, তখন সত্যসত্যই যে দেশে বিপ্লবের কার্য্য সুরু হয়ে গেছে,

বোমার দলের কাজ যে অনেকদূর এগিয়েছে, ব্রহ্মবান্ধব এসংবাদ রাখতেননা। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে জামিনে খালাস করে নিয়ে আসা হল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিন তোমার সাজা হবে মনে কর ভায়া?" ব্রহ্মবান্ধব উত্তর করলেন, "দু' তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড তো বটেই।" মনোরঞ্জনবাবু সহাস্যে বললেন, "ওঃ! তার ভেতর আগে তোমাকে জেল ভেঙ্গে মুক্ত করে আনবো।" ব্রহ্মবান্ধব তো অবাক! বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এতটা অগ্রসর হয়ে পড়েছো?" উপাধ্যায় নিজে বিপ্লবী না হলেও বিপ্লবীদের ছিলেন একান্ত অনুরাগী জন। মনোরঞ্জনের কাছে জেলভাঙার কথা শুনে অবিনাশের কাছে এসে সাগ্রহে প্রস্তাব করলেন তিনি—"আমাকে একটা বোমা দিন, আমিই হবো ভারতের প্রথম বোমারু।"

কিন্তু ভারতে প্রথম বোমারু হবার সৌভাগ্য ব্রহ্মবান্ধবের হয় নি। গ্রেপ্তারের পর জামিনে খালাস অবস্থায়ই তিনি এক সময় বলেছিলেন—ফিরিঙ্গিরা জেলে আমায় আটকে রাখতে পারবেনা। সংসারমোহত্যাগী সন্ন্যাসীর এই কথাই সত্য হল। মামলার শুনানী আরম্ভ হল ২৩ সেপ্টেম্বর। ব্রহ্মবান্ধব বললেন, স্বরাজ আন্দোলন বিধাতৃ নির্দিষ্ট। বিদেশী গবর্ণমেণ্টের নিকট এর জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন। জাতীয় আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে এর পরে বহু ব্যক্তি মামলা পরিচালনায় সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন। এখানেই তার আরম্ভ। ব্রহ্মবান্ধব তার কাজের জন্য সরকারের নিকট জবাবদিহি করেন নাই, ফিরিঙ্গির জেল তাঁকে আটক করতেও পারেনি। জামিনে খালাস থাকাকালেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতা নিয়ে তিনি হাসপাতালে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

যুগান্তর প্রকাশ

কিন্তু বাংলায় বিপ্লবান্দোলনে সাপ্তাহিক 'যুগান্তর'এর প্রকাশ বোধহয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সমগ্র বাঙ্গালী জাতকে বিপ্লব মনোভাবাপন্ন করতে যুগান্তর যা করেছে, আর কিছুই তেমন করেনি। দেশবাসীকে শুনাতে হবে বিপ্লবের বাণী,—সমগ্র দেশে প্রচার .করতে হবে বিপ্লবের মন্ত্র—বারীন্দ্রের এই মত যখন পি মিত্র কোনমতেই মেনে নিলেননা, বারীন্দ্র তার দলবল নিয়ে এল গ্রে ষ্ট্রীটের নূতন আস্তানায়। কি মন্ত্রে নবযুগের আবাহন হবে, বিপ্লবের মঙ্গলশঙ্খ কি রবে বেজে উঠে জাতীয় জীবনে চেতনা আনবে, তারই জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল এখানে কয়েকটি যুবকের মনে। কিন্তু এপথে অর্থাভাবই এদের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প নিয়ে নূতন দল মূল অনুশীলন সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ তো দূরের তথা, এদের দৈনন্দিন আহারের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাই বা কোথায়? যারা নিজ নিজ গৃহে থেকে বিপ্লবদলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত তাদের বিশেষ অসুবিধা হলনা। কিন্তু যারা যুগদেবতার আহ্বানে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের দেখা দিল উপবাসের সম্ভাবনা। বারীন্দ্র, অবিনাশ প্রভৃতি কয়েকজনেব অদৃষ্টে ঘটতে লাগলো প্রায়ই অর্ধোপবাস এবং মাঝে মাঝে উপবাসও। গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীরই এক কক্ষে বারীন্দ্র রাত্রিযাপন করতেন সুধীরের সঙ্গে এক তক্তপোষে। কিছু জুটলে ষ্টোভ বা কুকারে রান্না হত। অরবিন্দ তখনও বরোদা থেকে চাকুরী ছেড়ে আসেননি। তিনিও মাঝে মাঝে এসে এই গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠতেন। তখন তাঁরই উপর ভার পড়ত—ষ্টোভের রান্না সুপক্ক হলে নামিয়ে রাখার। কিন্তু নির্জন ঘরে একমনে বসে থাকতে থাকতে অরবিন্দ

কখন ডুবে গেছেন বিশ্বমানবের মুক্তির ধ্যানে তা নিজেই টের পাননি। পরে বারীন্দ্র বা অবিনাশ এসে দেখতেন ষ্টোভের রান্না অর্দ্ধদগ্ধ হয়ে গেছে। এই আধপোড়া খাবারেই সেদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হত। গায়-কোয়াড কলেজের ৭০০৲ টাকা বেতনের অধ্যাপক পর্য্যন্ত ঐ ই খেতেন। দেশমাতৃকার মুক্তি যারা জীবনের ব্রত করেছেন, নিজের আহার নিদ্রার চিন্তার সময় তাদের কোথায়? জীবনের প্রতি চির উদাসীন অরবিন্দকে আমরা প্রথম দেখি বিপ্লবী যুবকদলের মধ্যে। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু নূতন যুবককে নিয়ে আসা হত এবাসায়। বারীন্দ্র এবং দেবব্রত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যুক্তিজাল বিস্তার করে এবং বিরোধী পক্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে এদের বিপ্লবী করে তুলতেন। অরবিন্দ এখানে থাকতেন নীরব শ্রোতা। কোনকিছুই তাকে বিচলিত করতে পারতোনা! বিশ্বমানবের মুক্তিধ্যানরত এই মহামানবের নিকট দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের ব্রতও যে পরবর্ত্তীকালে গৌণ আকার গ্রহণ করেছিল, তারই আভাষ এখানে দেখতে পাই। বিশ্বমানবের মুক্তির চিন্তাই তাঁকে পাগল করেছিল, তারই প্রথম অভিব্যক্তি এসেছিল দেশপ্রেম অবলম্বন করে। কিন্তু জাতীয়তার ক্ষুদ্র গণ্ডী এই মানবকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি বুঝেছিলেন, সমগ্র বিশ্বে এক জাতি আছে—সেজাতির নাম মানব জাতি। তাই মানব মুক্তির মধ্যেই সন্ধান করেছিলেন ভারতের মুক্তি। তাঁর এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে কিনা ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিবে। বিপ্লবান্দোলনের মধ্যে তিনি এসেছিলেন, এর নেতৃত্বও নিয়েছিলেন কিন্তু এর গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে ধরা দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। এই গ্রে ষ্ট্রীটের বাসা থেকেই অরবিন্দ এপ্রিল মাসে বরিশাল কনফারেন্সে যোগ দিতে যান।

ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পড়তে পড়তেই বারীন্দ্রের মনে প্রথম পত্রিকা

প্রকাশের কথা উদয় হয়। পরে দেবব্রত বসু এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য্যকে জানালে তারাও এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এই তিনজন এবং অবিনাশ চক্রবর্ত্তী নামে জনৈক মুন্সেফ ও এদের জনৈক কবিরাজ বন্ধু এই পাঁচজনে মিলে পরামর্শ করে স্থির হলো 'যুগান্তর' নাম দিয়ে খাঁটি বিপ্লবতন্ত্রের কাগজ বার করতে হবে। পত্রিকা প্রকাশের প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে বারীন্দ্র ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম করেন নাই। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ তার "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের একপৃষ্ঠা" গ্রন্থে লিখেছেন, "যুগান্তর নাম আমার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়া এই নাম নির্ধারিত করিয়াছিলাম। এই নামটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়।" পত্রিকার প্রথম সম্পাদকরূপে আমরা প্রথম ভূপেন্দ্রনাথকেই দেখি।

কাগজ প্রকাশের সঙ্কল্পে সবাই অটল, কিন্তু তার সম্বল কোথায়? মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্ত্তী যদিও ছিলেন সরকারী কর্মচারী তবুও তিনি ছিলেন বিপ্লবীদলের অন্তরঙ্গ কর্মী, বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেই কাজে নেমেছিলেন। একটি সাপ্তাহিকের জন্য ৫০৲ টাকা দিয়ে তিনি উৎসাহ দিলেন—প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করে অর্থের আবেদন করলেই অর্থ মিলে যাবে। অর্থাভাবে কিছুতেই কাগজ বন্ধ হয়ে যাবেনা। এসম্পর্কে 'বিজলী' পত্রিকায় ১৭শ সংখ্যায় বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন—

"আমাদের এক মুন্সেফ ও এক কবিরাজ বন্ধুর প্ররোচনায় আমরা ৫০৲ টাকা হাতে নিয়ে যুগান্তরের সূত্রপাত করলাম। অবিনাশ মাত্র তখন আমার কাজের সহায়। এতবড় দারিদ্র তখন পি মিত্র মহাশয়কে ত্যাগ করার ফলে আমাদের জীবনে এসেছে যে, অবি ও আমি উড়ে

বামুনের দোকানের দুইখানি পরোটা, তরকারী ও আলুর দম কিনে খেয়ে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করি। সশস্ত্র বিপ্লবের খাঁটি আয়োজন দেশ জুড়ে করবো—বাঁশের বাগ্‌দী মার্কা লাঠি ও ছোরাছুরির পায়—তারার মোহ ত্যাগ করে, এইপ্রকার হিসাবকরা আদর্শালুতার তাড়নায় বালীগঞ্জী আসরের চাঁদার আনুকূল্য থেকে আমরা তখন বঞ্চিত। মুন্সেফ বন্ধু অবিনাশ চক্রবর্ত্তী পরামর্শ দিলেন—ঐ ৫০৲ টাকা সম্বল করে কোন গতিকে এক সংখ্যা কাগজ বার করা হোক এবং নমুনা হিসাবে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, রংপুর, কটক প্রভৃতি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়ে সংবাদ পাঠানো হোক অর্থ সাহায্যের জন্য। আগুনের আখরে লেখা অনুপম এই যুগান্তরকে রূপায়িত দেখলে অর্থ আপনি আসবে, যাদের কাজ তারাই অর্থ জুগিয়ে এই বিপ্লবী উল্কাকে জিইয়ে রাখবে।"

মূলকেন্দ্রের আত্মকলহের কথা তখনও শাখাকেন্দ্রগুলিতে পৌঁছায়নি। সভাপতি পি মিত্র বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে বাইরে যেতেননা। কর্মীদের মারফত শাখাকেন্দ্রের সঙ্গে মূলকেন্দ্রের যোগাযোগ রক্ষিত হত। বারীন্দ্রকুমার আসার পর তিনিই একাজ বিশেষভাবে করতেন। সুতরাং শাখার কর্মীরা বারীন্দ্রকুমারকেই চিনত। তারা জানত—বৈপ্লবিক কাজ কর্মে বারীন্দ্রকুমারই তাদের পরিচালক এবং তাঁর যেকোন নির্দেশ দলেরই নির্দেশ। পি মিত্র তাদের সভাপতি, শাখা ও মূলকেন্দ্রের সর্বাধিনায়ক তিনি। বাইরের দিক থেকে এই অবস্থা পরেও অক্ষুন্ন ছিল। বিপ্লবী দলের যে বাৎসরিক সম্মেলন হত তাতে পি মিত্রই সভাপতিত্ব করতেন। এই সম্মেলনে আত্মোন্নতি সামিতিও যোগ দিত। এই ভাবে, শিথিল হলেও, পরস্পরের মধ্যে একটা সংযোগ সূত্র বহুদিন পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। গুপ্ত সমিতিগুলির নিয়ম এই ছিল যে প্রত্যেক শাখাকেন্দ্রের পক্ষে মূল কেন্দ্রকে অর্থসাহায্য করতে হবে। প্রত্যেক পল্লীকেন্দ্র তার আয়ের

একটা অংশ মহকুমাকেন্দ্রে পাঠাবে এবং মহকুমাকেন্দ্রের আয়ের একটা অংশ জেলাকেন্দ্রে যাবে এবং প্রত্যেক জেলাকেন্দ্রকে তাদের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ কলিকাতায় মূলকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে। মেদিনীপুর, রংপুর, বাঁকুড়া এবং কটক কেন্দ্রের প্রেরিত অর্থ বারীন্দ্রের মারফৎই মূলকেন্দ্রে জমা হত। মেদিনীপুর থেকে একটি মোটা টাকা আসত। কাঁথির দিগম্বর নন্দী বৎসরান্তে একহাজার টাকা পাঠিয়ে দিতেন। ১৯০৫ সালের টাকাটা এরই মধ্যে এসে গেছে এবং তা খরচ হয়েও গেছে। প্রকৃতপক্ষে এতদিন পর্যাপ্ত ধনী ব্যক্তিদের দেওয়া চাঁদার থেকেই কলকাতাকেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহ হয়েছে। একমাত্র দিগম্বর নন্দীর টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকাই মূলকেন্দ্রে আসেনি, যদি এসে থাকে তাও উল্লেখযোগ্য নয়। তবুও এদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা বারীন্দ্রই করতেন। তাই পি মিত্রের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে বারীন্দ্র যখন মূল অনুশীলন সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন, সঙ্গে সঙ্গে এইসকল শাখাও মূলকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে এই শাখাকেন্দ্রগুলি নূতন দলেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ল।

অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর পরামর্শ অনুযায়ী বারীন্দ্রও স্থির করলেন যুগান্তর পত্রিকা প্রথম সংখ্যা বার করে তা বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গেই তাদের কাছে চাওয়া হবে তাদের দেয় আর্থিক সাহায্য—এতদিন যা চাওয়া হয়নি।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হল। ২৭নং কানাইধর লেনে ৩২৲ টাকা ভাড়ায় একখানি ঘর ভাড়া লওয়া হল এবং এখানেই যুগান্তরের অফিস খুলে বসলেন দুই অগ্নিপূজারী—অবিনাশ ও বারীন্দ্র। বলা বাহুল্য, একখানি ছেঁড়া মাদুর ভিন্ন এ অফিসের তখন দ্বিতীয় কোন সম্বল নেই। দেবব্রত এবং বারীন্দ্রের লেখা সম্বল করে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর গেল

প্রেসে এবং এর সঙ্গে প্রতিকেন্দ্রে গেল পত্রাকারে এক উত্তেজনাপূর্ণ আবেদন।

বৃটিশ রাজ্য ধ্বংসের খোলা আবেদন নিয়ে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর প্রকাশিত হল। বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হল হকারদের কাছে। কিন্তু কলকাতা আড়ম্বরের রাজ্য, এখানে আভিজাত্যেরই জয়! অনাড়ম্বর আভিজাত্যহীন যুগান্তরকে এখানে চিনবে কে? অগ্নিপূজারীর দল শুনলেন কলকাতার রাস্তায় তাদের অতি আদরের সাধনার ধন অনাদৃত। শুনে ক্ষুন্ন হলেন, বুঝলেন—বিপ্লবের জন্য বাঙালীর মন এখনও প্রস্তুত হয় নি। কিন্তু একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লেন না। কিছু পয়সা পকেটে নিয়ে অবিনাশ ও বারীন্দ্র দুজনে বেরোলেন ঘোড়াটানা ট্রামে, মোড়ে মোড়ে পৌঁছে—হাঁক দিয়ে হকারদের ডেকে বলতে লাগলেন—"ওরে যুগান্তর আছে?" এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই নিজেদের কাগজ কিনতে লাগলেন। কিন্তু এ উপায়ও বিশেষ সুবিধা হলনা দেখে নিজেরাই রাজপথে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলেন ফিরি করে যুগান্তর বিক্রী করা।

এইভাবে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর প্রকাশিত হ'ল এবং তা নিঃশেষও হল যথাসময়ে। কিন্তু তা থেকে অর্থাগম কিছুই হলনা। বারীন্দ্র এবং অবিনাশ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু বিপ্লবের যুগদেবতা তখন বাঙ্গালী জাতিকে বোধহয় হাতছানি দিয়ে ডাকছেন, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিপ্লবের জয়ডঙ্কা বাজাবার পৌরোহিত্য যে বাঙ্গালী জাতই করবে এ বোধ হয় বিধাতারই ইঙ্গিত। তাই প্রথম সংখ্যা প্রকাশেই যুগান্তরের জীবনদীপ নির্বাপিত হলনা। টাকা এসে জুটল অপ্রত্যাশিত ভাবে। প্রথম সংখ্যা প্রেসে সঙ্গে দিবার বিভিন্ন কেন্দ্রে যেসব আবেদন প্রচারিত হয়েছিল, ঐ আবেদন দলের

রংপুর কেন্দ্রেও পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে একদিন এক যুবক পাঁচশ টাকা নিয়ে এসে বারীন্দ্রের নিকট উপস্থিত হল। প্রকৃতপক্ষে এই অর্থেই হল যুগান্তর প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবীদল সেদিন এ অর্থকে বিধাতার দান বলেই গ্রহণ করেছিল। রংপুরের ন্যায় একটি অখ্যাতকেন্দ্রে পাঁচশত টাকা দিবার মতো কোন লোক আছে এ তারা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবে নি। বারীন্দ্রকুমার বা তার দলের আর কেউ এর আগে কোনদিন রংপুরে যাননি। প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির পরে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রীয় অফিসে অর্থ সাহায্য এসে পৌঁছেছিল এবং বাঙ্গালী সমাজে যুগান্তর পরিচিত হবার পরে তার আয়ও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ঐ মিলিত অর্থে চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে একদিন যুগান্তরের নিজস্ব সুবৃহৎ ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু রংপুর কেন্দ্রের এই পাঁচশত টাকা না হলে বারীন্দ্রের বিপ্লব প্রচারের স্বপ্ন যে অঙ্কুরেই বিলীন হয়ে যেত এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। গোপন বিপ্লবের ইতিহাসে এরূপ অপ্রত্যাশিত দান এর আগে ও পরে বহুবার বহু ক্ষেত্রে ঘটে এসেছে। দাতা আপনাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রেখে শুধু বিপ্লবী দলের সাহায্যের জন্যই দান করেছেন বিপ্লবান্দোলনে এরূপ নজীর বিরল নয়।

বারীন্দ্রের দলের পরিচালনায় দেড় বৎসর যুগান্তর চলে। প্রথম সাত আট মাসের মধ্যে এর প্রচার সংখ্যা দাঁড়ায় সাত আট হাজার এবং এই সংখ্যা শেষ দিকে পৌঁছায় ত্রিশ হাজারে। যুগান্তরের অন্যতম লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদিপর্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেননা। উপেন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যুগান্তরের লেখক হিসাবে বিপ্লবের আড্ডায় এসে যোগ দেন এবং পরে পুরাদস্তুর বিপ্লবী হয়ে পড়েন। কম্পোজিটারের তাগিদে লেখা খুঁজতে গিয়ে যুগান্তর অফিসের ছেঁড়া কাগজের মধ্যে আবিষ্কৃত হলো একদিন এক চমৎকার গরম গরম লেখা—লেখকের

নাম উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। এই ঠিকানা অনুসরণ করে বারীন্দ্রকুমার স্বয়ং উপস্থিত হলেন চন্দননগরে এবং উপেন্দনাথ চন্দননগরে থেকেই যুগান্তরের অন্যতম স্থায়ী লেখক হলেন। এর পরে উপেন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে বন্দেমাতরমের সম্পাদকীয় দলে যোগ দেন। কিন্তু অবিনাশ গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসে বিপ্লবীদের আড্ডায়। এই যুগান্তরী আড্ড সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন তার নির্বাসিতের আত্মকথায়—"১৯০৬ সালের তখন শীতকাল। কলিকাতায় যুগান্তর অফিসে আসিয়া দেখিলাম, ৩।৪টি যুবক মিলিয়া একখানি ছেড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। গুলিগোলার অভাব তারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় কথা নয়, এবিষয়ে তাহারা সকলেই একমত। দেবব্রত যুগান্তরের সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারে গৃহিণী বিশেষ। বারীন্দ্র তখন দেওঘরে পলাতক। * * * পরে বারীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পরে তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে দশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হইবেই হইবে।

যুগান্তর সম্পাদনা সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "ক্রমে যুগান্তর সম্পাদনার ভার বারীন্দ্র ও আমার উপর আসিয়া পড়িল। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম। মনে হইত যেন দেশের প্রাণপুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাহার অন্তরের কথা বাহির করিতেছেন।"

ঘরের কোণে একটা ভাঙা বাক্সে যুগান্তর বিক্রীর টাকা রাখা হত।

সে বাক্সে কোন তালাচাবি ছিলনা, কত টাকা আসত, কত খরচ হত এবং কে খরচ করত তারও কোন হিসাব নিকাশ ছিলনা। যুগান্তরের পরিপূর্ণ সমৃদ্ধির দিনেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। এই সময়ে একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে এল এক চিঠি সাবধান বাণী নিয়ে। যুগান্তরে যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তা নাকি রাজদ্রোহ সূচনা। কর্ত্তারা শাসিয়েছেন, ভবিষ্যতে এরূপ করলে আইনের কবলে পড়তে হবে। চিঠি পড়ে তরুণ বিপ্লবী দল তো হেসেই অস্থির! আইন! সে আবার কি? ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতা যারা, মাতৃভূমি উদ্ধারের সুমহান কর্ত্তব্য যারা জীবনের ব্রত করে নিয়েছে, তাদের দেখানো হয়েছে আইনের ভয়!

বিপ্লবমন্ত্র প্রচার

যুগান্তর প্রকাশের পর প্রথম দশ মাস পুলিশ এর প্রতি উদাসীন ছিল। তাই এই অনলমুখে অবাধে চলছিল বিপ্লব মন্ত্র প্রচার। ১৯০৭ সালের ১১ই এপ্রিলের যুগান্তর পত্রিকায় এক প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল—'এসো অরাজকতা'। তাতে লেখা ছিল—অরাজকতার সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং সেই অরাজকতাকে আহ্বান করি, ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব।" এই বিপ্লবের জন্য কত সহজে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা সম্ভব, এবং গোপনে বিস্ফোরক তৈরী করাও যে অসম্ভব নয়, এ বিষয়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয়েছিল ১৯০৭ সালের ১২ আগষ্টের যুগান্তরে। এই প্রবন্ধে ছিল—আর 'এক উত্তম উপায়ে দেশের বিপ্লবীর অস্ত্রবল বৃদ্ধি করা যায়। রুশীয় বিপ্লবে দেখা গেছে, রুশ সম্রাট জারের সৈন্যদলে বহু বিপ্লব অনুরাগী লোক ছিল। সময়ে বহু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই সব

সৈন্য বিপ্লবীদলে যোগ দেয়। ফরাসী বিপ্লবেও এই নীতি সুফল প্রসব করেছিল। এদেশে রাজশক্তি বিদেশী হওয়ায় আমাদের আরও সুবিধা, কারণ বিদেশী শাসকদের দেশবাসীর মধ্য থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়। ইংরাজের অধীন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র সন্তর্পণে প্রচার করতে পারলে কাজ আমাদের এগিয়ে যাবে। তা' হলে শাসক শক্তির সঙ্গে কার্যতঃ সংঘর্ষ বাঁধলে বিপ্লবীরা এই সৈন্যদের বিদ্রোহীদলে শুধু যে পাবে তা নয়, শাসক প্রদত্ত তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বিপ্লবের কাজে পাওয়া যাবে।

যুগান্তর এইভাবে খোলাখুলি ভাবেই বিপ্লব মন্ত্র প্রচার করত। দেবব্রতের ছদ্মনাম ছিল—"যোগা ক্ষ্যাপা"। যোগা ক্ষ্যাপার চিঠি যুগান্তরে প্রায় নিয়মিতই প্রকাশিত হত। ১৯০৭ সালের ২৬শে আগষ্টের চিঠিতে ছিল— সম্পাদক ভায়া, আমি শুনতে পাই তোমার কাগজ বাজারে হাজারে হাজারে বিক্রী হচ্ছে। যদি অন্ততঃ হপ্তায় ১৫০০০ সংখ্যা বিকোয় তাহলে ৬০০০০ লোক পড়ছে। এই ষাট হাজার পাঠককে আমি গুটীকতক কথা বলবার লোভ সামলাতে না পেরে অকালে এই লেখনী ধারণ করেছি। আমি পাগল, অধ্যাতস্থ এবং হুজুগে মানুষ! আমার আনন্দের পাত্র উপচে উঠে, যখন আমি চার দিকে অরাজকতা দেখি নামতে। তখন অন্ধ মূক হয়ে, আর থাকতে পারিনা। চারদিক থেকে লুঠতরাজের খবর আসছে, আর আমি স্বপ্ন দেখছি যেন ভাবী গোরিলা যোদ্ধার দল অর্থ লুণ্ঠনে লেগে গেছে আর আগামী মুক্তির যুদ্ধ যেন আরম্ভ হয়ে গেছে ঐ লুঠতরাজের আকারে। * * * হে লুণ্ঠন, আমাদের সহায় হও। এতদিন তুমি পুষ্পকীটের মতো গুপ্ত থেকে দেশের অন্তর শূন্য ক'রে আনছিলে। এখন এসো, সবত্র জাগিয়ে তোল ক্ষাত্রবীর্য মানুষের বুকে। তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে যেদিন

ভারতবাসী আবার তোমাকে স্মরণ ও পূজা করবে সেইদিন তুমি আনবে তাদের সশস্ত্র করবার অর্থ, তুমি আনবে রণ কৌশলের শিক্ষা। সেইজন্য আজ আমি তোমায় পূজা করি।"

যুগান্তরে যখন এইসব উন্মাদনাকারী লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল, বন্ধুবান্ধবের সন্ধ্যাও তখন পিছিয়ে ছিল না। সন্ধ্যায় প্রকাশিত হল—"আমরা চাই পূর্ণ মুক্তি। দেশে ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গি আধিপত্যের লেশমাত্র থাকতে দেশের কোন উন্নতির আশা নেই। স্বদেশী, বয়কট সবই নিরর্থক, সেগুলি যদি আমাদের পূর্ণ মুক্তি অর্জনের উপায় না হয়। * * ফিরিঙ্গির কৃপার দানে আমরা থুথু দিই, তাকে বর্জন করি, আমরাই নিজের শক্তিতে গড়ে তুলবো আমাদের মুক্তি।" এর পূর্বে প্রকাশ্য ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা বা ইংরেজের অধীনতা পাশ হতে পূর্ণমুক্তির কথা আর কেউ বলেনি। কংগ্রেসের মধ্যে এ ছিল ভাবনার অতীত।

মুক্তি কোন পথে ?

যুগান্তরের ভাল ভাল লেখা সংগ্রহ করে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিলো—"মুক্তি কোন পথে ?" রাওলাট রিপোর্ট এর সংক্ষিপ্ত সারাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। এই পুস্তকে দেখানো হয়েছে কংগ্রেসের শিক্ষানীতির অসারত্ব এবং মুক্তি কোন পথ ধরে আসবে তাও দেখানো হয়েছে! বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কি করে সংগ্রহ করতে হবে, গেরিলা যুদ্ধের জন্য কি করে যুবকদলকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, বেতন ভোগী সিপাহী দলের মধ্যে কি ভাবে দেশানুরাগ প্রচার করতে হবে, কি করে তাদের ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তুলতে হবে, অস্ত্রশস্ত্র কি করে সংগ্রহ করতে

হবে, এবং কি করেই বা প্রস্তুত করতে হবে—সব কিছুরই নির্দেশ আছে এই বই এ।

বিপ্লবযুগের প্রথম পর্বে চাঁদা ও দানের টাকায় কাজ চলত। কিন্তু প্রকৃত বিপ্লব যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ততই দেখা গেল এ যথেষ্ট নয়। বিপ্লবীরা স্থির করলেন, দেশের কল্যাণে দেশহিত পরান্মুখ বা স্বদেশীবিরোধী ধনীদের অর্থ বলপ্রয়োগে হরণ করে, তা দেশেরই কাজে লাগাতে হবে এবং এইভাবে অরাজকতা যখন বৃদ্ধি পাবে তখন বিদেশী শাসকের রাজস্বও কোষাগার লুণ্ঠন করে তুলতে হবে বিপ্লবকে আসন্ন করে। প্রকাশ্য বা স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান বিপ্লবী নেতাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কর্মীগণের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা এত আন্দোলনে তৎটুকুই অংশ গ্রহণ করতে পারবে যতটুকু তাদের বিপ্লবের কাজের সহায়ক হয়।

'মুক্তি কোন পথে' বই এ বোঝানো হয়েছিল—শ্বেতাঙ্গ হত্যার জন্ত পেশীবহুল সবল দেহ আবশ্যক করে না। এ জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নানাভাবে সংগ্রহ করতে হবে। কিছু কিছু আমদানী করতে হবে বিদেশ থেকে এবং কিছু নির্মাণ করতে হবে এদেশে গোপনে। এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণের কলা কৌশল বিদেশে গিয়ে শিখে আসতে হবে। সিপাহাদের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার সম্পর্কে বলা হয়েছিল—এইসকল সৈনিক ভারতবাসী। তারা ইংরেজের বেতনভোগী কিন্তু তাদেরও হৃদয় আছে, তারাও রক্ত মাংসের মানুষ। দেশের দৈন্য এবং বন্ধনজানত দুর্গতির কথা তাদের বুঝিয়ে বললে তাদের হৃদয়েও দেশানুরাগের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

আলি-র বোমার মামলার পূর্ব পর্যন্ত যুগান্তরে এইভাবে চলেছিল বিপ্লব প্রচার। বোমার মামলার রায়ে প্রধান বিচারপতি

জেঙ্কিনস বলেছিলেন, 'যুগান্তরের লেখায় প্রতি ছত্রে ঝড়ছে ইংরেজ বিদ্বেষাগ্নি, প্রতি পংক্তিতে রয়েছে বিপ্লবের অনুপ্রেরণা, কি করে বিপ্লবকে রূপায়িত করতে হবে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।"

বিপ্লবীদলে একজন পরম উৎসাহী কর্মী ছিল, নাম কেশব গুপ্ত। উত্তর কলিকাতায় কেশব প্রিন্টিং প্রেস নামে তার মামার ছিল এক প্রেস। যুগান্তরের নিজস্ব প্রেস হবার আগেএখানে হত তাদের অনেক কাজ। পরে কেশবের মামার নিকট হতেই একটা হ্যাণ্ড প্রেস কিনে চাঁপাতলা ফার্ষ্ট' লেনে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় সুমতি প্রেস। এজন্য কেশব প্রেসকেও ফলে পুলিশের হাতে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। মাণিকতলা বোমার মামলায় বারীন্দ্র প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পর কেশব গাঢাকা দেন। আত্মরক্ষা করবার জন্য তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে পাদ্রীর বেশে পাহাড়ীদের মধ্যে ঘুরে বেডাতেন।

যুগান্তরের নিজস্ব প্রেসের নাম ছিল সুমতি প্রেস। "মুক্তি কোন পথে" সুমতি প্রেস থেকেই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হত। ঘোগাক্ষ্যাপার পত্র নামে দেবব্রতের লেখাগুলিও এইভাবে প্রকাশিত হত। বারীন্দ্র কুমার নিজে লিখতেন "রণনীতি" যুগান্তরে ধারাবাহিক ভাবে। এর উপাদান সংগ্রহ করতেন 'Cassel's Russo Japanese war' থেকে। এই লেখাও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

যুগান্তরের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অফিস স্থানান্তরিত হয়েছিল কানাই ধর লেন থেকে চাঁপাতলা ফার্ষ্ট' লেনে। এখানেই ছিল তার প্রেস। যুগান্তরের নেশা তখন বাঙ্গালী পাঠক সমাজকে পেয়ে বসেছে। ত্রিশ হাজার সংখ্যা বিলি হবার পরেও ক্ষিপ্ত হকার দলকে ঠেকিয়ে রাখা দায়। আরও চাই। দুই পয়সার কাগজ অনেক সময়ে কালো বাজারে একটাকা মূল্যে পর্য্যন্ত বিক্রী হত।

কিন্তু যুগান্তরের অবাধ বিপ্লব প্রচারের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের টনক নড়ল। প্রথমে পত্রযোগে এল দুই একবার হুসিয়ারী বা সতর্কতার বাণী এবং তার পরেই যুগান্তর অফিসে আরম্ভ হল পূর্ণ লাহিড়ী এবং ইনসপেক্টর এলিসের ঘন ঘন যাতায়াত। বিপ্লবীদল বুঝলেন, বিনা বাধায় বিপ্লব প্রচার আর চলবে না। অচিরেই ধরা পড়তে হবে সকলকে। এর মধ্যেই কাজে লাগা চাই। ধরা পড়বার আগেই বিপ্লবের প্রকৃত কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে।

বন্দেমাতরম ও শ্রীঅরবিন্দ

অরবিন্দ এর পূর্বেই বরোদার চাকরী ছেড়ে চলে এসেছেন। এসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতার পদ গ্রহণ করেছেন ৭৫৲ টাকা বেতনে। বরোদায় চাকুরীর তার বেতন ছিল ৭০০৲ টাকা। যুগান্তরের বয়স যখন সবে মাত্র পাঁচ মাস, এই সময়ে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, হরিদাস হালদার এবং আরও কয়েকজনের চেষ্টায় দৈনিক বন্দেমাতরম্ প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের ৭ আগষ্ট। অরবিন্দ তখনও বাংলা দেশে আসেন নাই। কিন্তু এর অল্পদিন পরেই অরবিন্দ বাংলায় এসে যুগপৎ প্রকাশ্য ও গোপন আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বন্দেমাতরমের সম্পাদনাভারও তাঁর উপর পড়ে। যুগান্তর ও সন্ধ্যা যা করেছিল বাংলা দেশে বন্দেমাতরম তাই করেছে সমগ্র ভারতে। এ সম্বন্ধে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন, "যুগান্তর ও সন্ধ্যা বাংলায় করেছিল অগ্নিযুগের দীপান্বিতার আয়োজন, তাদের ভাবের দীপ্ত মশাল জেলে, প্রাণে প্রাণে অসন্তোষ ও ব্যাকুল মুক্তি কামনায় দীপশিখা জেলে জেলে। ঠিক সেই কাজই করেছিল অরবিন্দর ইংরাজি দৈনিক বন্দেমাতরম্—সারা ভারতের ক্ষেত্রে,

মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ, মাদ্রাজ, বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কংগ্রেসী অকংগ্রেসী শিক্ষিত সমাজের মাঝে।"

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখন বলতেন, জাতির আত্মবিকাশের কথা। শিক্ষায়, শিল্পে, বিজ্ঞানে জাতিকে উন্নত করে তুলতে হবে, তবেই উন্মুক্ত হবে স্বরাজ লাভের পথ এই ছিল তাদের কথা। কিন্তু অরবিন্দই দেশের লোককে পথম শোনালেন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বা Passive Resistance এর কথা। অনেকে মনে করেন ভারতীয় রাজনীতিতে এইকথাটি গান্ধীজীর আমদানী কিন্তু তা নয়, শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় এই 'Passive Resistance' সম্পর্কে ধারাবাহিক কতগুলি প্রবন্ধ লিখেন। এমনকি, শিক্ষালয় বর্জন, আদালত বর্জন প্রভৃতি যে পঞ্চবিধ বর্জন নিয়ে গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়েছিল তারও নির্দ্দেশ শ্রীঅরবিন্দই দিয়েছিলেন বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় এই সকল প্রবন্ধে। ১৯০৭ সালের ৯ই এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিলের মধ্যে এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, সম্পূর্ণ বিদেশী প্রভাববিমুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠাই হবে আমাদের লক্ষ্য, দেশের লোকের নিকট দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেন্ট হলেও আমাদের চলবেনা। বিদেশের প্রভাব তা সে যত সামান্যই হোকনা কেন আমরা বিন্দুমাত্র তা বরদাস্ত করবনা। কিন্তু আত্মনির্ভরতা এবং আত্মবিকাশের পথে এ আসতে পারে না। কোনপ্রকার প্রতিরোধ ব্যতীত এ লক্ষ্যে পৌছান আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিন পথে এ প্রতিরোধ দেওয়া যেতে পারে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বা Passive Resistance দ্বারা শাসনব্যবস্থা অচল করে তোলা যায়। আয়র্লাণ্ডে মিঃ পারনেল এই পন্থায় কার্য্যসিদ্ধ করেছেন। আয়র্লাণ্ডে তিনি সরকারের কর বন্ধ করেছিলেন এবং ওয়েষ্ট মিনিষ্টারে আয়ার্লাণ্ডের ব্যতীত অন্য কোন

প্রকার কাজ করতে দেন নি। দ্বিতীয় পন্থায় দেশব্যাপী সরকারী কর্মচারীদের হত্যা, দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি, ধর্মঘট, কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতি দ্বারা অরাজকতা সৃষ্টি করেও গবর্ণমেণ্টের কাজকর্ম অচল করে তোলা যায়। রুশ বিপ্লবী দল এই পন্থা অনুসরণ করে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করেছে। তৃতীয় পথ সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ। এ পথ শাসনব্যবস্থা অচল করে তোলার পথ নয়, প্রচলিত শাসনব্যবস্থা অবসানের পথ। পরাধীন, নিপীড়িত জাতি এপথে অনুসরণ করে অতীতে বহুবার সাফল্য অর্জন করেছে এবং সফল হতে হলে আমাদেরও এপথ অনুসরণ করতে হবে, কারণ দ্রুত সাফল্যের জন্য এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।"

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ

শ্রীঅরবিন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের পথকেই স্বাধীনতা অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু ভারতের তৎকালীন অবস্থায় নিরুপদ্রব প্রতিরোধ পন্থাই পরীক্ষা করে দেখবার পরামর্শ দিয়েছেন এই সকল প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, "এছাড়া অন্যান্য পন্থা অন্যায় বা অসঙ্গত একথা আমি বলছিনা। অত্যাচার থেকে অবিলম্বে মুক্তিলাভ রুশিয়ায় হয়ে উঠেছিল বাঁচবার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাই বর্বর দমননীতির বিরুদ্ধে হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ তাদের পক্ষে ছিল প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তির মর্য্যাদা যখন রক্ষিত হচ্ছে, এবং দমননীতি যখন আইনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের কোন পন্থা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এ পথে সাহসের প্রয়োজন কম হতে পারে, প্রতিঘাত কম থাকতে পারে কিন্তু

এখানে প্রয়োজন হবে অধিকতর বীরত্ব, ব্যাপক সহিষ্ণুতা এবং অপরিসীম ক্লেশ সহ্য করবার ক্ষমতা।" শেষোক্ত কথাগুলি গান্ধিজীর কথার প্রতিধ্বনি বলেই মনে হয়।

অনেকেই জানেননা ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই শ্রীঅরবিন্দ একথা আমাদের জানিয়েছেন, বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "সশস্ত্র বিপ্লব পথে দেশের অল্পসংখ্যক ব্যক্তি তাদের রক্তপাতদ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করে থাকেন সবার জন্য কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ পন্থায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপামর সাধারনকেই অংশগ্রহণ করতে হয়, সবাইকেই সাধ্যমত ক্লেশবরণ করতে হয়।"

শ্রীঅরবিন্দ এইসকল প্রবন্ধে নিরুপদ্রব প্রতিবোধ পন্থা অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন বটে, কিন্তু ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের সম্ভাবনাকে একেবারে পরিহার করেন নাই। বরং বলেছেন, এই পন্থাই শ্রেষ্ঠ এবং অবশ্য ফলপ্রসূ পন্থা। সুতরাং সমগ্র ভারতে বিপ্লবী মনোভাব সৃষ্টি করতে বন্দেমাতরমের এইসকল প্রবন্ধ কম সাহায্য করেনি।

এইভাবে বাংলায় রাজনীতিতে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবে আরম্ভ হল বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব। এদিকে বিপ্লবীরাও বুঝলেন, তাদের প্রতি দমননীতি প্রয়োগের দিন এগিয়ে আসছে। সুতরাং প্রচারকার্য্য ত্যাগ করে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে নামা প্রয়োজন। ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে যুগান্তরের পরিচালনাভার নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক প্রভৃতির হাতে দিয়ে বারীন্দ্রকুমার, দেবব্রত, অবিনাশ প্রভৃতি গাঢাকা দিলেন। মুরারীপুকুর বাগান আড্ডায় গোপনচক্রে আরম্ভ হল বোমা তৈরী কারখানার কাজ। পুলিশের লাঞ্ছনার ফলে যুগান্তর পরিচালকদল পরিবর্ত্তিত হল বলে জানিয়ে দেওয়া হল বন্দেমাতরম পত্রিকায়।

কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন যে এর আগেই একেবারে আরম্ভ হয় নি তা নয়। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগোকে বোমাতৈরী শেখার জন্য ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল এরও এক বছর আগে ১৯০৬ সালের ১৩ আগষ্ট। মুরারিপুকুর বাগানে বোমা তৈরী আরম্ভ হবার আগে ঢাকুরিয়ার সর্পসঙ্কুল জঙ্গলে এক জীর্ণ বাটীতে ছিল বিপ্লবীদলের বোমা তৈরীর আড্ডা। বিভিন্ন পরামর্শের জন্য আড্ডা বসতো কখনও টাউন স্কুলে, কখনও এখানে সেখানে। অরবিন্দের নিকট রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীর নীচে গৃহীত হতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এইভাবে বিপ্লবের উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত হল। এরপরে আরম্ভ হল প্রকৃত বিপ্লব বা বৃটিশ নিধন যজ্ঞ। ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনাকে ভিত্তিকরে আরম্ভ হল এর কাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ এবং রামদাস শিবাজী পূজিতা ভবানী সেদিন ছিল এই বিপ্লবীদলের প্রেরণার উৎস। শ্রীমদ্ ভাগবদগীতা ছিল এই বিপ্লবের বেদ, ইতালীয় ম্যাটসিনি এবং গ্যারিবল্ডি, চিতোরের রাণা প্রতাপ, বাংলার প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি বারভূঞা, মহারাষ্ট্রের শিবাজী রামদাস, সিপাহী যুদ্ধের ঝান্সীর রাণী, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের এব্রাহাম লিঙ্কলন প্রভৃতি ছিলেন বিপ্লবীদলের আদর্শ। বিপ্লবীদলের নিকট দেশজননী ছিলেন এক ঐশী শক্তির আধার। এই শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেই আরম্ভ হত বিপ্লবীর বৈপ্লবিক জীবন।

বিপ্লবের আদর্শ

বারীন্দ্রকুমার একস্থানে বলেছেন, একমাত্র যুগান্তর দলেরই এই আত্মসমর্পণের আদর্শ ছিল এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবই এর মূলে। কিন্তু

এ সত্য নয়। আত্মসমর্পণের মনোভাব যতক্ষণ বিপ্লবীর মধ্যে না আসত, কোন বিপ্লবী দলই তাকে প্রকৃত বিপ্লবী বলে গ্রহণ করতনা। কর্মণ্যে-বাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন—এই নীতি প্রত্যেক বিপ্লবীকেই গ্রহণ করতে হত তার জীবনে। বিপ্লবী বাংলার আদর্শ ছিল দুইটি লাইনের একটি সংস্কৃত শ্লোক—

জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তি।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি ॥

ধর্ম কাকে বলে আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, অধর্ম কি তাও আমি জানি, কিন্তু তা থেকে নিবৃত্ত হবার ইচ্ছা আমার নেই। ভগবান হৃদয়ে থেকে তিনি যা করাবেন তাই আমার কাজ। শ্লোকটির উৎস কোথায় এ নিয়ে বৈপ্লবিক জীবনে অনেক বিতর্ক শুনেছি। গীতার মধ্যে এ শ্লোকটি আছে বলে মনে হয়না। পরবর্ত্তী জীবনে শুনেছি শ্লোকটি মহাভারতের দুর্য্যোধনের উক্তি। কি উপলক্ষে কোথায় এ উক্তি তিনি করেছিলেন আজও জানিনা। কিন্তু তবুও বৈপ্লবিক জীবনে আমার ন্যায় যে কোন বিপ্লবীর নিকট এই ছিল আদর্শ। বিপ্লবীকে নরহত্যা করতে হত, অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করতে হত। তার স্বাভাবিক ভদ্র অন্তর এতে যখন সায় দিতে চাইতনা, তখন উপরের দুটো লাইনই তাকে পথ দেখাত। ধর্মাধর্ম আমি জানি কিন্তু বিচার বিবেচনা করে দেখবার ভার আমার উপর নয়। কাজ করাব ভার আমার উপর মাত্র। আমার এ কাজের নিদেশ আসছে তাঁরই নিকট থেকে—এই বিরাট বিশ্ব যাঁর নির্দেশে চলছে। বিপ্লবী বাংলা একে মৌখিকভাবে সেদিন গ্রহণ করেনাই, এ ছিল তাদের অন্তরের কথা। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল বলেই বিপ্লবী যখন নরহত্যা করেছে, দেশের কল্যাণের পক্ষে, স্বাধীনতার অভীষ্ট লাভের

পক্ষে যাকে অন্তরায় মনে করেছে তাকে সরিয়ে দিয়েছে পৃথিবী থেকে, তার নির্মমতা পৌঁছেছে হৃদয়হীনতার সীমায়। পিস্তলের প্রথম গুলীতে শত্রু হয়ত ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, রক্ত হয়ত ছিটকে পড়ছে তার দেহ থেকে, কিন্তু বিপ্লবীর হাতের পিস্তলের তবুও বিরাম নেই। আবার চলল গুলী— এখনও ছট্‌ফট্ করছে যে, ভূতলশায়ী দেশবৈরীর দেহ এখনও যে নিষ্পন্দ শান্ত হয়নি। হয়ত বেঁচে উঠবে আবার—তাই চলল গুলীর উপর গুলী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে নিঃসংশয় হয়েছে তার কর্ত্তব্য পালন করা হয়েছে নিখুঁতরূপে। কিন্তু বিপ্লবীর এই রূপই যথার্থ রূপ নয়, নিপীড়িত আর্ত্তের দুঃখে বিপ্লবীর হৃদয় যখন কেঁদে উঠত, তার ভিতরেও কোনরূপ কৃত্রিমতা ছিলনা। নিপীড়িত আর্ত্তের সেবা বিপ্লবীগণ মনপ্রাণেই গ্রহণ করেছিল। এ ছিল তার ব্রত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ৪০ বৎসর কাল বাংলায় যতপ্রকার সেবাকার্য্য হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়েছে। এখানেও তাদের নিষ্ঠার কোন অভাব হয় নি। দুর্গত বা নিপীড়িত দেখলেই বিপ্লবীর হৃদয় স্বাভাবিক ভাবেই ছুটে যেত তার কাছে, ব্যাকুল হত মন তার কি করে দুঃখ মোচন করবে তার, কি করে টেনে আনবে তাকে ভগবানের কল্যাণের রাজ্যে। মমতা ও নির্মমতা হৃদয়ের এই দুটী পরস্পর বিপরীত গুণের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল বিপ্লবীদের মধ্যে। তার কারণ, সুখেষু বিগতস্পৃহ এবং দুঃখেষু………গীতার এই জীবনকে সে প্রকৃত আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

যে কোন বিপ্লবীর জীবনেই আমরা এই আদর্শের প্রভাব দেখতে পাই। একমাত্র বারীন্দ্রকুমারদেরই এই বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবের ফলও একে বলা চলেনা। তাছাড়া ভবানী মন্দিরের আদর্শও যে সবটুকু মহারাষ্ট্র থেকে এসেছে তাও সত্যি নয়;

বাঙ্গালীর বিপ্লবজীবনে মহারাষ্ট্রের কোন প্রভাব আমরা প্রায় দেখিনা। শিবাজী উৎসব বাংলা দেশে সাড়ম্বরে আরম্ভ হয়েছিল বটে, কিন্তু এ অনুষ্ঠান বাঙ্গালী সমাজে স্থায়ী হয় নাই। ফলতঃ, ভবানী মন্দিরের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবার বহু পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র গেয়েছিলেন বন্দেমাতরম্। সুজলা সুফলা জন্মভূমিকে তিনিই প্রথম দেখেছিলেন মাতৃভাবে, আবাহন করেছিলেন মাতৃমন্ত্র দিয়ে। ডেকে বলেছিলেন তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতকে—

"এস ভাই সকল, আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দি। এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলে, ছ কোটি মাথায় বহে ঘরে আনি। এসো, অন্ধকারে—ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠছে, নিবছে, ওরা পথ দেখাবে—চল, চল, অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্রতাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করে আমরা সাঁতার দি। সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করে আনি। ভয় কি? না হয় ডুববো, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় অবস্থানকালে ভবানী মন্দিরের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন একথা সত্য। এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করবার জন্যই তিনি প্রথম যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে এবং পরে বারীন্দ্রকুমারকে বাংলায় পাঠান। ভবানীমন্দিরের আদর্শ এই যে নির্জনে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বৈপ্লবিক সন্ন্যাসীদলের সাহায্যে তাতে পূজা অর্চনা চলবে এবং এই উপায়ে সংগৃহীত অর্থে চলবে বিপ্লবের কার্য্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মধ্যকলিকাতায় হেমচন্দ্র মল্লিকের গৃহে এক সভাও হয়। এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিপ্লবীগণ ব্যতীত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতিও ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রস্তাবটির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বেলুড় মঠ তো রহিয়াছে

আবার অন্য একটি মঠের প্রয়োজন কি? যা হোক, ত্রিবেদী মহাশয়ের এ প্রতিবাদ সত্ত্বেও একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠিত হল এবং এক পুস্তিকাও প্রচারিত হল। বারীন্দ্র ও হরিশ ঘোষ নামে একজন কর্মী প্রেরিত হল বিহারে চাঁদা আদায় করতে এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গেলেন ছোট নাগপুরের জঙ্গলে মন্দিরের স্থান নির্ব্বাচন করতে। কিন্তু প্রকৃত মন্দির কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা এখানেই শেষ হয়।

তবে বাঙ্গালীর বৈপ্লবিক জীবনে যে ধর্মের অসামান্য প্রভাব ছিল একথা অস্বীকার করা চলেনা। এ দেশে যে সমস্ত বিপ্লবীদল গড়ে উঠেছিল তাতে কোন মুসলমান না থাকার এ একটা কারণ। দেশমাতৃকার কাল্পনিক মূর্ত্তি বাঙ্গালী বিপ্লবী জীবনে এমনভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছিল যে বিপ্লবীর চিন্তায় ও কর্মে এই-ই ছিল প্রেরণায় উৎস। তাই মুসলমানকে কিছুতেই এর মধ্যে আকর্ষণ করতে পারতনা।

বিপ্লবীবাংলা ও বিবেকানন্দের প্রভাব

এখানে প্রশ্ন হতে পারে বাঙ্গালীর বিপ্লবাদর্শের মধ্যে এই ধর্মপ্রভাবের মূল কোথায়? উনবিংশশতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী জীবনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাবই যে এর মূল এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আত্মসম্বিৎহারা বাঙ্গালীকে বিবেকানন্দই প্রথমে শুনিয়েছিলেন আশার বাণী—

"বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো তোমরা মানুষ, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম, বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম।"

বিবেকানন্দের এই বিশ্বাসবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাঙ্গালী আরম্ভ

করেছিল বিপ্লবের পথে তার জয়যাত্রা। এইজন্যই বাঙ্গালীর বৈপ্লবিক জীবন কখনও ধর্মপ্রভাব মুক্ত হতে পারে নি।

তাছাড়া, বৈপ্লবিক জীবনে অগ্নিমন্ত্র, দীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে কিভাবে প্রবেশ করেছিল তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা দেশে আসার পূর্বেই এ সম্ভব হয়েছিল। সমাজ জীবনে স্বামী বিবেকানন্দেরই এই প্রভাব, তা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বিপ্লবক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবের ফল এনয়।

এই ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে আরম্ভ হল যুগান্তরীদলের বিপ্লবায়োজন। কিন্তু এই সময়ে অপর দলও যে নিশ্চেষ্ট ছিল তা নয়। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নারাণগড়ে ছোটলাট এণ্ড্‌ ফ্রেজারের গাড়ীর নীচে বোমা রেখে উহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে এবং ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল হয় মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণ। এইদুটা হল যুগান্তরী দলের প্রথম বৈপ্লবিক কাজ। কিন্তু এর আগেই কৃষ্ণনগরে পাদ্রী হিকিন্সকে গুলী করা হয় এবং ঢাকায় ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবকে হত্যার চেষ্টা হয়।

সুতরাং বাংলা দেশে খাটি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বারীন্দ্র এবং তার সঙ্গীগণ কর্তৃক আরম্ভ হয়েছে, বারীন্দ্রকুমারের এ দাবী সত্য নয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতির কথা ছেড়ে দিলেও বারীন্দ্রের দলের বাইরে এমন অনেক বিপ্লবী এই সময়ে ছিলেন, যারা পরবর্ত্তীকালে এদেশে এবং বিদেশে বৈপ্লবিক আদর্শ নিষ্ঠার গৌরবময় পরিচয় রেখে গেছেন। এরমধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাৎসরিক সম্মেলন

তবে পরবর্ত্তীকালে বৈপ্লবিক দলগুলির মধ্যে দলীয় বিরোধ যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল, এই সময়ে তার অস্তিত্ব ছিলনা বললেই

হয়। উদ্দেশ্য সাধনে কর্মীগণ যে শুধু পরস্পরকে সাহায্য করত তা ন অনেক সময়ে পরস্পরের কার্য্য সক্রিয় অংশও গ্রহণ করত। মাণিকতল বোমার মামলার আসামীদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ নন্দী ছিলেন আত্মোন্নতি সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য। যুগান্তর প্রকাশ নিয়ে মতদ্বৈধতার জন্য বারীন্দ্রকুমারের দল মূল অনুশীলন সমিতি ত্যাগ করলেও প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে বাৎসরিক সম্মেলনে মিলিত হতেন একথা পূর্বেই বলেছি। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন কালেও এরূপ একটি সম্মেলন হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মীগণ সম্মেলনে যোগদিতে আসেন। ময়মন সিংহের প্রতিনিধিত্ব করেন পরেশ লাহিড়ী, ঢাকার পুলিনদাস, বর্ধমানের মহাদেবানন্দগিরি, ত্রিপুরার নিখিল মৌলিক নদীয়ার ললিত চট্টোপাধ্যায় ও যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মেদিনীপুরের জ্ঞানেন্দ্র বসু এবং যশোরের বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য। অনুশীলন সমিতির সম্পাদক সতীশচন্দ্র বসু এখানে উপস্থিত ছিলেন। বারীন্দ্রকুমারের দল ও তার সমর্থকদের মধ্যে যারা এই সম্মেলনে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিক, অবিনাশ চক্রবর্ত্তী, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, বারীন্দ্র ঘোষ, দেবব্রত বসু এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। আত্মোন্নতি সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন ইন্দ্রনাথ নন্দী। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন এর অল্পদিন পূর্বে তিনি ব্যাঘ্র হত্যা করেছিলেন। ব্যাঘ্রের কবলমুক্ত তিনি তখনও পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেননি। প্রমথনাথ এই সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপস্থিত সকলকে যুগান্তর পত্রিকাকে সাহায্য করতে বলেন। পরবর্ত্তী বৎসরেও এইরূপ অধিবেশন হয়েছিল।